ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক সমগ্র প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

বাংলা ১৩২৯ সাল
প্রতিষ্ঠাতা
স্বর্গত
আশুতোষ ধর

সচিত্র মাসিক

শিশুসাথী

ইং ১৯২২ সন
৪৭শ বর্ষ
অগ্রহায়ণ সংখ্যা
১৩৭৫

বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা]

সূচী

[প্রতি সংখ্যা ৬০ পয়সা

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	এসো হেমন্তিকা (কবিতা)	কে. এম. শাম্‌সের আলী	৪৬৭
২।	উত্তর বঙ্গ (কবিতা)	শ্রীপঞ্চানন তেওয়ারি	৪৬৮
৩।	বেনগাজীর আখড়া	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	৪৬৯

শিশুদের
পেটের বেদনা সত্বর
উপশম করে
বেঙ্গল
কেমিক্যালের
গ্রাইপ্
মিকশ্চার

শিশুদের পেটের ফাঁপ ও
অজীর্ণ জনিত সকল প্রকার
পীড়ায় আশু ফলপ্রদ।
কোন অহিতকর উপাদান
না থাকায় সকল বয়সের শিশুদের
নির্ভয়ে দেওয়া যায়।

বেঙ্গল
কেমিক্যাল কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

সূচী

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
৪।	জলদানব	শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়	৪৭৬
৫।	প্রণাম করি (কবিতা)	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিক	৪৮১
৬।	শিপুর মন-পড়া বিদ্যে	শ্রীশৈল চক্রবর্তী	৪৮২
৭।	বা	শ্রীচুনীলাল রায়	৪৯২
৮।	স্বদেশ প্রাণ	শ্রীমোহিত রায়	৪৯৮
৯।	খুকুর খেলার রাজ্যে (কবিতা)	শ্রীবিশ্বপ্রিয়	৫০০
১০।	বিজ্ঞান-পত্র—		
	চাঁদের কথা	শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০১

সূচী

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১১।	ছড়া-ছড়া		
	(১) হজমী	শ্রীবৈদ্যনাথ গুপ্ত	৫০৩
	(২) ছড়া	শ্রীমলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০৪
১২।	তোমাদের পাতা		
	(১) বন্যাকবলিত ভগবানপুরে	শ্রীভবেশচন্দ্র চাউল্যা	৫০৫
	(২) পুতুল কথা বল (কবিতা)	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়	৫০৮
১৩।	মজার ম্যাজিক		
	প্যারিসে দেখানো ম্যাজিক	যাদুরত্নাকর এ. সি. সরকার	৫০৮
১৪।	পটকা রোগা ছি ! (কার্টুন)	শতদল ভট্টাচার্য	৫১০

ছোটদের উপহার দেবার মতো কয়েকটি বই

হাসির বই

শিবরাম চক্রবর্তীর **হাসির গল্প** ১·৫০
নারায়ণ গাঙ্গুলীর **হাসির গল্প** ২·৫০
স্বপনবুড়োর আরো **হাসির গল্প** ২·৫০
বিভূতি মুখোঃ **হাসির গল্প** ২·৫০
আশাপূর্ণা দেবীর **হাসির গল্প** ২·৫০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের **হাসির গল্প** ২·৫০
কুমারেশ ঘোষের **হাসির গল্প** ২·০০

ক্লাসিক

কথা সরিৎসাগরের গল্প ৩·০০
বত্রিশ পুতুলের উপাখ্যান ৩·৫০
ছোটদের আরব্য উপন্যাস ২·৫০
দশকুমার চরিতের গল্প ১·৫০
উদয়ন ও বাসবদত্তার গল্প ২·৫০
পুরাণের সেরা গল্প ২·০০
মহাভারতের গল্প ১·৫০

নানা দেশের রূপকথা মনোরম গুহ-ঠাকুরতা ২·০০ নীল সাগরের নীচে ২·০০
ওয়ার অ্যাণ্ড্ পীস ॥ অশোক গুহ ২·০০ পিকউইক পেপারস্ ॥ অশোক গুহ ২·০০
গল্পের রাজা ক্রীলভের গল্প ॥ অনিলেন্দু চক্রবর্তী ২·০০ গল্পে কাদম্বরী ১·৫০
রবিনসন ক্রুসো ॥ অশোক গুহ ২·০০ রবীন হুড ॥ দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ২·০০
গালিভার্স ট্র্যাভেলস্ ॥ দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ২·০০ শিব্রাম THE ভূপর্যটক ২·৫০

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং ॥ ৬।১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২। ফো: ৩৪-৪৩১০

সূচী

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১৫।	ওস্তাদের ওস্তাদি	শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়	৫১১
১৬।	অলৌকিক ও অলৌকিকত্ব	শ্রীদুর্গাদাস সরকার	৫২০
১৭।	বীরবলের গল্প	শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়	৫২৫
১৮।	শরীরচর্চা বিষয়ক আলোচনা জাতির শক্তি—দেশের শিশু	মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকার	৫২৮
১৯।	খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	৫৩০
২০।	নতুন ধাঁধা	শ্রীফাগুরাম সোরেন	৫৩২
২১।	গতমাসের ধাঁধার উত্তর		৫৩২
২২।	সম্পাদিকার চিঠি		৫৩৩

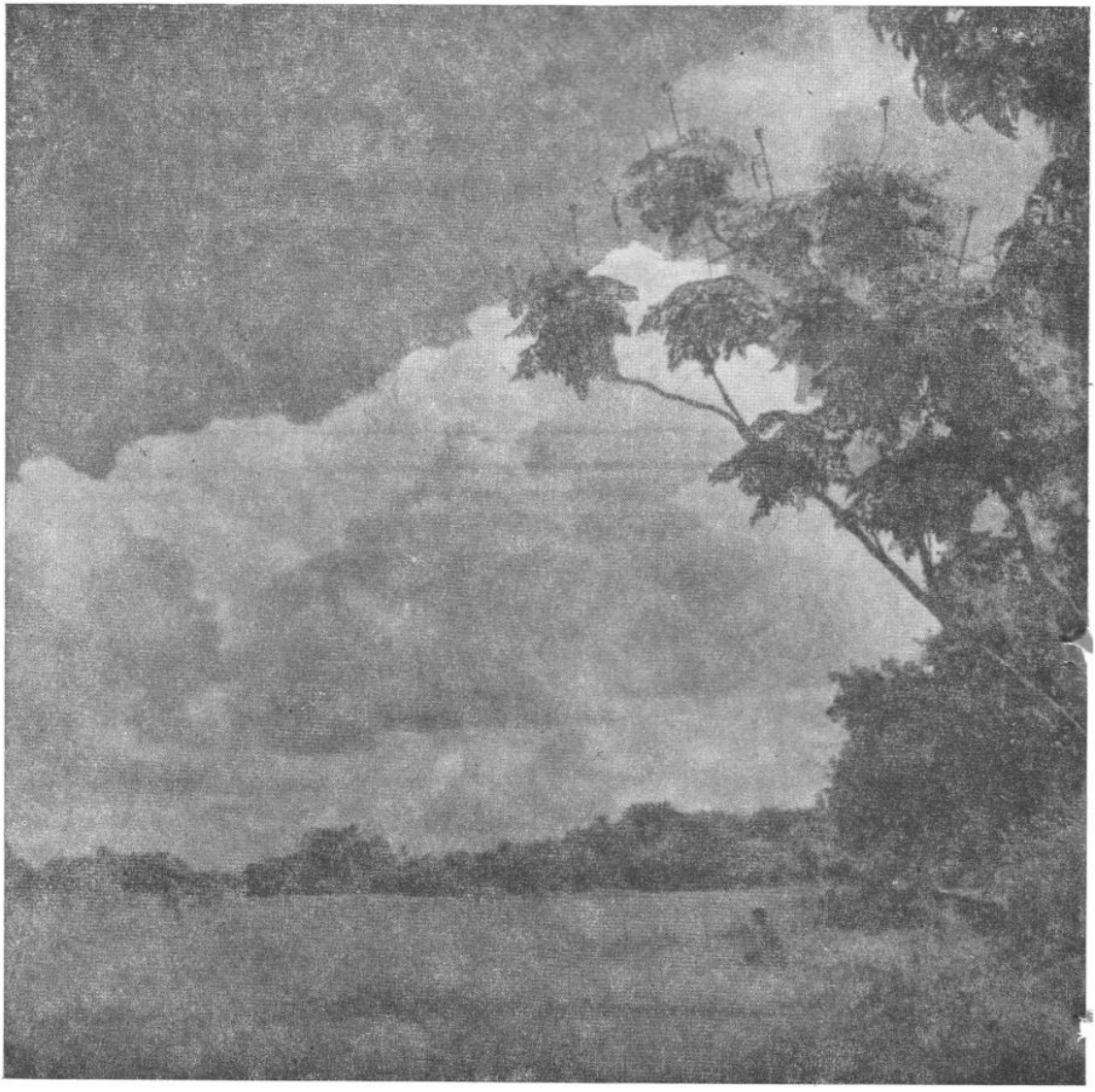

আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা

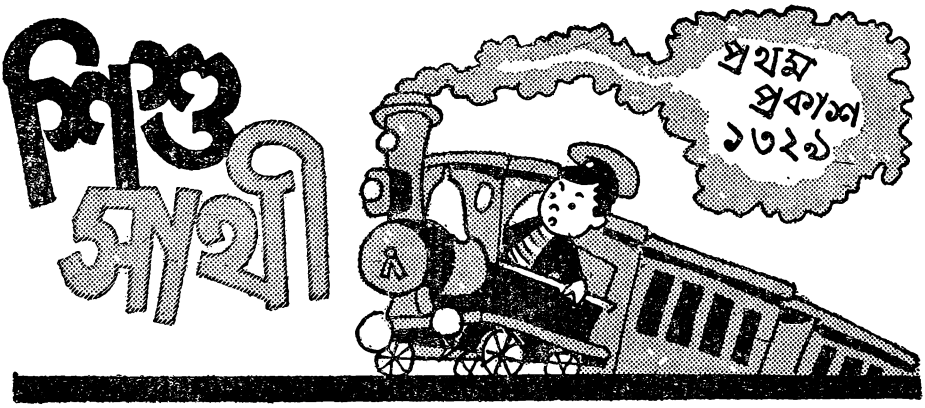

৪৭শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ | ৮ম সংখ্যা

এসো হেমন্তিকা

কে. এম. শমশের আলা

এসো হেমন্তিকা।
তটিনী-তড়াগ-নীরে সিনান করি,
কেতকী-হেনার বাস অংগে ভরি,
বনজ-কুটজ-রেণু তিলক পরি,
কনক দীপ্ত হেম ললাটিকা॥

এসো সজীব, সতেজ শ্যাম কুঞ্জ-ছায়ে,
লাক্ষা-দলিত তব মৃদুল পায়ে;
এসো ঝিরঝিরে হিলমিলে ভোরালীবায়ে
অলকে কলাপী-পাখা চন্দ্রলিখা॥

এসো হিরণ-কিরণ-মাখা চতুর্দোলে,
বিহগ-কাকলী ভরা ধরণী কোলে।
এসো রাখালীয়া-বাঁশরীর সম্মোহনে,
ভুবন-ভুলানো রূপে ফুল-বালিকা॥
এসো হেমন্তিকা॥

উত্তর বঙ্গ

শ্রীপঞ্চানন তেওয়ারি

সর্বহারা রিক্ত যারা
আমাদেরই মা, বোন, তারা
দূর দূরান্ত উত্তরে ;
পাহাড় ধ্বসে প্লাবন এসে
বিভীষিকার ভয়াল ত্রাসে,
প্রলয় নাচন নেচে গেল
কোন্ ভাঙনের নৃত্য রে ?

মৃত্যু দূতের করাল বদন
আর্তস্বরে ভরল গগন
ভাসলো তারা কোন অজানায়
ভয় ভাবনার অন্তরে ;
তুষার ঘেরা শৃঙ্গচূড়ার
স্বপ্ন সৌধ মন্দিরে
লক্ষ জীবন ঘুমিয়ে আছে
গিরি গুহার কন্দরে !

মাতার ক্রোড়ে জীবন-প্রদীপ
নিবল ধীরে ধীরে
আয় ফিরে আয়, আয়রে বলে
মা ডাকিছে তারে ;
পাগল হল জননী আজ
বোঝাই কেমন করে
খেপা নটরাজ নাচেরে ঐ
বিষাণ নিয়ে করে।

আর্তের ডাক দিগ্-দিগন্তে
সব যোগাযোগ ছিন্ন,
কোন্ খেয়ালীর মত্ত মাতন
আঁকল চরণ-চিহ্ন।

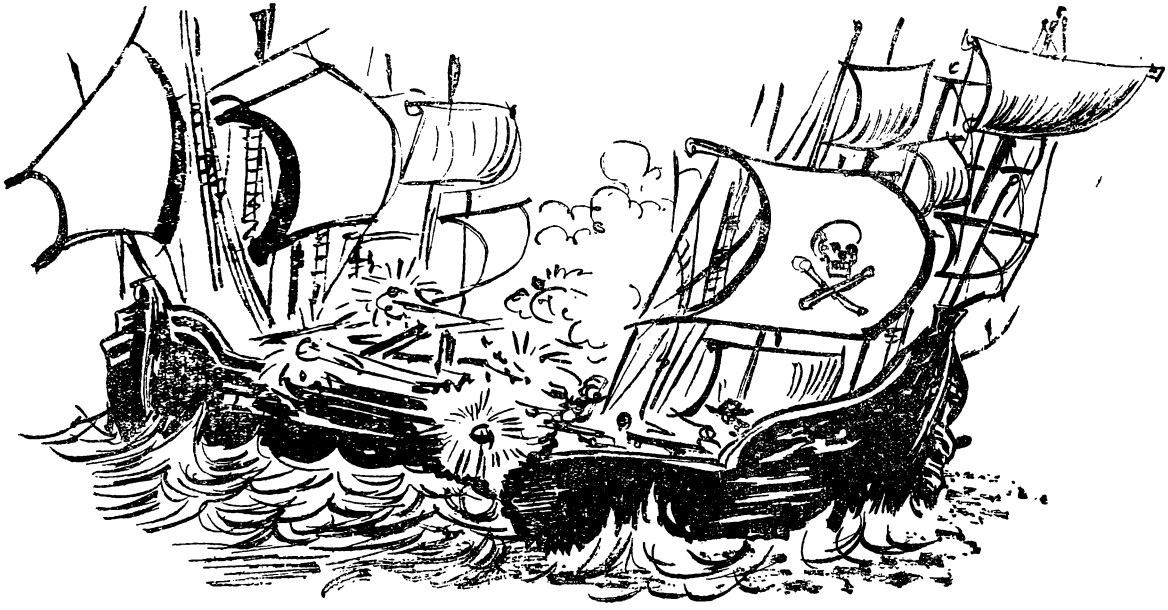

বেনগাজীর আখড়া

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

দ্বিতীয় পর্ব

দিন যায়। সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত, অন্ধকারের সমাগম থেকে ঊষালোকের পূর্বাভাষ। দিন ও রাত নিয়ে সময় এগিয়ে চলে। আমরা দিনের হিসাব গণি, মহাকালের হিসাব চলে সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংস নিয়ে। বিশ্ব এই গণনার উপকরণ। বিশাল এই মাটির ঢেলা পৃথিবীর বুকে অতি ক্ষুদ্র কোটি কোটি মানুষ এই প্রগতির সাক্ষ্য বহে চলেছে। জন্ম, বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য, মৃত্যু—নিজের অজ্ঞাতেই দেহের বিকাশ চলে, এবং একদিন দেহটা নিষ্প্রাণ হয়ে, এক এক গোষ্ঠীর লোকান্তরের পর এক একটা যুগ শেষ হয়। বর্তমানের জন-সমাজ ভাবে, গত সমাজের চেয়ে আমরা অনেকটা অগ্রগামী। কালচক্রের তিনটি রূপ এইভাবে সমভাবে চলতে থাকে। এই তিন রূপের তিন প্রতীক—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। এই তিনকে নিয়ে অখণ্ড মহাকাল।

মহাকাল, অনন্ত, গতিশীল, নীরব। তার মাঝে খণ্ড খণ্ড রূপ নানাভাবে প্রকাশ পায়, সেই রূপকে অবলম্বন করে ফুটে ওঠে সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বিষাদ, আলো আর ছায়া,

সেই খণ্ড রূপের মাঝেই তা আবার হারিয়ে যায়। নিঃসীম মহাকালের মাঝে সবই যেন এক একটা বুদ্বুদ—ফুটছে, ঝলমল করছে, মিলিয়ে যাচ্ছে—কেন ফুটলো, কেন চমক দিল, কোথায় হারালো, তা কেউ জানে না। যা জানি না, যা জানা যায় না, সেই অজানাই হচ্ছে আদিশক্তি—পরব্রহ্ম।

এই ব্রহ্মকে মানুষ ধারণায় আনতে পারে না, তাই তাকে খণ্ড খণ্ড শক্তি রূপে অর্চনা করে। এক এক শক্তি রূপকে তারা এক বরদা বলে ভাবে। তাই হিন্দুর এতো দেবতা। ব্যবসায়ে ধনলাভের সৌভাগ্য দেবেন গণেশ, বর্ষণে শষ্যলাভের সৌভাগ্য দেবেন ইন্দ্র, জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যলাভের সৌভাগ্য দেবেন বিষ্ণু, বিদ্যালাভের সৌভাগ্য দেবেন সরস্বতী, সমরে জয়ী করবেন কার্তিকেয়, জীবনের সব শঙ্কা ও দুর্গতি নাশ করবেন শ্রীদুর্গা।

॥ এক ॥

বয়স মাত্র আঠারো হলেও বেণীমাধব এই ক'দিনের মধ্যেই বুড়ো হয়ে গেছে। কথা কম কয়। কখন চুপ করে বসে থাকে বারান্দায়, কখন বা ঊষা দুর্গের ভাঙা দেয়ালটার কোণে বড় পাথরখানার উপর বসে সমুদ্রের পানে তাকিয়ে থাকে। শূণ্য গৃহে কেবলই মা ও ছোট বোনটির কথা মনে পড়ে। বুকের মধ্যে একটা আবেগ ধাক্কা দিয়ে গলার কাছে ওঠে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়, তখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়, সাগরের তটে একান্তে গিয়ে বসে থাকে। স্নানাহারে কোন যত্ন নেই।

সংসারে উদাসী মানুষকে দেখার মত দু-দশ জন মানুষ থাকে। বেণীরও পড়শী আছেন সইমা। মায়ের আবাল্যের সখী, একটা দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও বোধ হয় ছিল। তিনিই সকাল-সন্ধ্যা খোঁজ খবর করেন, দু'বেলা ডাক দেন আহারের জন্য। এই নিঃসঙ্গ ছেলেটির বেদনাকে তিনি স্নেহের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দিতে চান। তিনি জানেন যে বেদনার অনুভূতি সময়ে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসবে। এজন্য কালক্ষেপ করতে হবে। বেণীর এই উদাসী ভাব আর উপেক্ষার খেয়ালকে তিনি কখন বিরক্তিকর মনে করেন না। শুধু বলেন—যাই কর্ বাবা, নিজের শরীরটার উপর নজর রাখ্, সময় মতো স্নানাহার কর্। তুই না খেলে যে আমাকেও উপোসী থাকতে হয়।

এই কথাটা শুনলেই মায়ের কথাটাই বেণীর আগে মনে পড়ে। সই মা'র মুখের পানে তাকিয়ে ভাবে—মা এখন কোথায়, কি করছে কে জানে! আর বোনটা!

বয়সের চেয়ে দুঃখের বোঝাটা বেণীর মাথার উপর চেপে বসেছে। দিন যাচ্ছে, কিন্তু সেই বেদনার ভার তো মন থেকে কমছে না। শুধু সমুদ্রের পানে তাকিয়ে বসে থাকতেই যেন ভাল লাগে, মানুষের সঙ্গ ভাল লাগে না। এই মানুষই তো দুষ্টামি করে তার উপর এই দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। এদের থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই তো শ্রেয়।

অনেক রাত অবধি সে সমুদ্র তীরেই বসে থাকে, সইমার ছোট ছেলেটি তাকে ডেকে আনে খাবার জন্য।

দিনের পর দিন কেটে যায়, বৈচিত্রহীন।

॥ দুই ॥

কেল্লার পরিখার পাশ দিয়ে বেণীমাধব চলেছিল সমুদ্র তীরে।

এ পথে লোকজন সাধারণতঃ কম চলাফেরা করে। আজ রীতিমত ভীড় দেখে বেণী বিস্মিত হলো, আনমনা ভাবটা বাস্তবে ফিরে এলো। এতো মানুষ কেল্লার ভিতরে যাচ্ছে কেন ?

বেণীও ভীড়ের মধ্যে ভিড়ে গেল।

পরিখার পুল পার হয়েই মস্ত ফটক, তোলা ফটক। তারপর আবার একটা দরজা। সামনেই মাঠ। সমুদ্রের তীর বরাবর এই মাঠ ছড়িয়ে আছে অনেকখানি। এখানে সৈন্যদের তাঁবু পড়ে, দশেরার দিনে ও মহরমের দিনে উৎসবের জমায়েৎ হয়। আজ সেইখানে অনেক মানুষের ভীড় জমেছে। সব মানুষ গিয়ে জমছে সেখানে। একটা কিছু ব্যাপার আছে নিশ্চয়ই। বেণীও একপাশে একটু নিরিবিলি দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো।

এবার নজরে পড়লো। একপাশে খানিকটা ঘেরা জায়গায় হাতীর পিঠে সুলতান বসে আছেন, কয়েকজন ঘোড়সওয়ার রক্ষী ঘিরে আছে তাঁকে। আর মাঠের মাঝে একটি কালো আরবী ঘোড়া নিয়ে দু'জন সইস দাঁড়িয়ে আছে। সুলতান কি যেন বললেন. নাকারা-ওলা হাঁক দিল। আঁট-সাঁট আধা পায়জামা ও হাতকাটা পিরাণ-পরা একটি জোয়ান লোক মাঠের মাঝে এগিয়ে গেল। একেবারে ঘোড়াটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ঘোড়াটার পিঠে একটা চাপড় মারলো আদর করার ভঙ্গিতে। তারপর রেকাবে পা দিয়ে এক লাফে উঠে বসলো ঘোড়ার পিঠে। সইস দু'জন ঘোড়ার রাশ ছেড়ে সরে গেল। আরোহী রাশ টানলো। ঘোড়াটা ক্ষণেক থমকে দাঁড়িয়ে রইল, তারপরেই এক লাফে ছুটতে সুরু করলো। তীরের মতো খানিকটা ছুটে গিয়ে খানিকটা পরেই সে পিছনের দু'পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে উঠলো। পিঠের মানুষটি এবার বুঝি পিছনে যায়। কিন্তু সে পিছলে পড়লো না।

ঘোড়া সোজা হলো। আরোহী এই সুযোগে ঠিকমতো বসতে যাচ্ছে, ঘোড়া আবার দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। পরক্ষণেই এমন এক ঝাঁকানি দিল যে আরোহী এবার ছিটকে পড়লো তার পিঠ থেকে। পিছনের পা দিয়ে ঘোড়াটা তাকে আরো তফাতে ছিট্‌কে ফেললো।

পরক্ষণেই ভীড়ের দু'পাশ থেকে দু'জন সইস এগিয়ে এসে দু'টো দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে দিলে ঘোড়াটার দিকে। একটা ফাঁস ঘোড়ার গলায় আটকালো। ঘোড়া আরো এগোতে গিয়ে বাধা পেল।

সইস দু'জন ঘোড়াটার পাশে এগিয়ে গিয়ে রাশ ধরে রুখে ফেললো। ঘোড়াটা বার দুয়েক তড়বড় করে উঠলো, কিন্তু সইস দু'জনও বলিষ্ঠ, দুই ঝাঁকানি দিয়ে ঘোড়াটি স্থির করে ফেললো।

আহত আরোহীর পানে তখন কারো নজর ছিল না। ইতিমধ্যে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সইস দু'জন ঘোড়াটিকে আবার সুলতানের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালো।

সুলতান নির্দেশ দিলেন। আবার নাকাড়া বাজলো। এবার দ্বিতীয় ব্যক্তি এগিয়ে এলো ঘোড়ায় চড়বার জন্য। এ-ও ঘোড়ার পিঠে কয়েকটা চাপড় মেরে আদর করলো, তারপর রেকাবে পা দিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়লো তার পিঠে। সইস দু'জন ঘোড়ার মুখ ছেড়ে দিলে। আরোহী ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলো। ঘোড়া কিন্তু এক পা এগোলো না। সোজা দু'পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে উঠলো। আরোহী কিন্তু পড়লো না। সে-ও রেকাবে ভর করে দাঁড়িয়ে উঠলো। ঘোড়াটি একবার চারপায়ে নামে, আবার দু'পায়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। আবার নেমে ঝাঁকানি দেয়। পর পর ছ'বার এইভাবে দাঁড়িয়ে ও ঝাঁকানি দিয়ে শেষ অবধি সে দ্বিতীয় আরোহীকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলো।

আরোহী লাফিয়ে পড়েছিল। যে সেই দাঁড়িয়েছে, তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটি মাথা ফিরিয়ে তাকে এমন এক ধাক্কা মারলো, যে সে সটান পড়ে গেল মাটিতে। সইস দু'জন এসে ঘোড়াটিকে ধরে ফেললো। রক্ষীরা এসে আরোহীকে তুলে নিয়ে গেল।

এবার তৃতীয় আরোহীর পালা।

সুলতানের নির্দেশ ও নাকাড়া বাজার সঙ্গে সঙ্গে সে এগিয়ে এলো। সোজা এসেই একেবারে লাফিয়ে উঠে পড়লো ঘোড়ার পিঠে। সইস ছেড়ে দিলে, ঘোড়া দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। আরোহী ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরলো দু'হাতে। ঘোড়াটা বার বার দু'পায়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, ঝাঁকানি দেয়, কিন্তু মানুষটি ঠিক পড়ে থাকে তার পিঠের উপর। পাঁচবার, সাতবার, দশবার, পনেরোবার দাঁড়িয়ে ঝাঁকানি দিয়েও ঘোড়া তাকে পিঠ থেকে ফেলতে পারলো না। কিন্তু তা বলে ঘোড় এগোলো না এক পা-ও।

ঘোড়ার পিঠে উপুড় হয়ে পড়ে থাকাই তো আর ঘোড়ায় চড়া নয়। সুলতান নির্দেশ দিলেন। সইস এসে ঘোড়া ধরলো। তৃতীয় আরোহী ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এলো।

এবার পর পর আরো তিনবার নাকাড়া বাজলো। একে একে তিনজনকে ডাকা হলো। তাদের ঘোড়ায় চড়ার কথা ছিল, তারা করজোড়ে সুলতানের কাছে নিবেদন করলো—আমাদের মাপ করুন হুজুর, এ ঘোড়ায় আমরা চড়তে পারবো না।

সুলতান ঘোষণা করলেন—সমবেত দর্শকদের মধ্যে যদি কেউ দুষ্ট ঘোড়াটার পিঠে চড়তে পারে, আমি তাকে একশো টাকা বখশিষ দোব।

একশো টাকা বড় কম নয়, কিন্তু দর্শকদের মধ্যে একজনও এগিয়ে এলো না! সুলতান বললেন—এই নগরে এমন একটা মানুষও নেই, যে একটা দুষ্ট আরবী ঘোড়াকে বশ করতে পারে!

বেণীমাধব এবার ভীড় ঠেলে এগিয়ে এলো খোলা মাঠের মাঝে। কিশোর বয়সী মানুষটি সোজা এগিয়ে গেল সুলতানের সামনে। বললো—হুজুর, আমি একবার চেষ্টা করে দেখবো।

সুলতান অবাক, পার্ষদরা অবাক,—ষোল আঠারো বছরের এই ছেলেটা এই ঘোড়ার পিঠে চড়বে? উন্মাদ নাকি!

—তুমি পারবে?

—চেষ্টা করবো হুজুর।

—তোমার অভিভাবক কে?

—আমার বাবা-মা, ভাই-বোন, কাকা-জ্যাঠা কেউ নেই হুজুর, আমি একা।

—একা?

—হ্যাঁ হুজুর। আমার বাবা রাধাগোবিন্দ সামন্ত পাঁচ বছর আগে গত হয়েছেন, আমার মা ও ছোট বোনকে কয়েকদিন আগে হার্মাদরা ধরে নিয়ে গেছে। আমি এখন একা।

—রাধাগোবিন্দ সামন্ত! গোবিন্দজীর মন্দিরের পাশে তোমাদের বাড়ী? তোমার নাম?

—বেণীমাধব সামন্ত।

—তুমি তো রাধাগোবিন্দের ছেলে? তোমাকেও তো হার্মাদরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল?

—আমি ওদের জাহাজ থেকে পালিয়ে এসেছি। আপনি অনুমতি করলে আমি ঘোড়াটা একবার চড়ে দেখতে পারি।

—তুমি কি পারবে?—সুলতানের মনে সন্দেহ দেখা দিল; তারপর বললেন,—বেশ, চেষ্টা করে দেখ, তবে সাবধান বাপু, পড়ে হাত-পা ভেঙো না!

সুলতানকে কুর্নিশ করে বেণী ঘোড়াটার পাশে এসে দাঁড়ালো। সামনে গিয়ে ঘোড়ার গলায়

মৃদু দু'বার চাপড় মারলো। ঘোড়াটা মুখ ফেরাতে গেল, কিন্তু সইস দু'জন শক্ত করে ধরে আছে। বেণী নির্ভয়ে ঘোড়ার নাকের উপর হাত বুলিয়ে দিল। ঘোড়াটা মাটিতে একবার পা ঠুকলো। বেণী এবার পাশে এসে ঘোড়ার জিন, রেকাব একে একে সব খুলে ফেললো। তারপর ঘোড়াটার শূণ্য পিঠে কয়েকবার আদর করে হাত বুলালো। হাত বুলাতে বুলাতে গলার কাছে চলে এলো, থুঁৎনিটা একবার নেড়ে দিয়ে বলে উঠলো—বেটা চু—চু!

এবার ঘোড়ার গলাটা জড়িয়ে ধরে বেণী সোজা ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়লো। আদর করে একটা চাপড় মেরে আবার বলে উঠলো—বেটা চু—চু!

তার সইসের হাত থেকে রাশটা টেনে নিয়ে ঘাড়ে আরেকটা চাপড় মেরে বললো—চল—চল—!

ঘোড়াটা এতটুকু চঞ্চল হলো না। একবার হাঁক ডেকে উঠলো—চিঁ হিঁ হিঁ!

আবার ঘাড়ে চাপড় মেরে বেণী বললো—বেটা চল্!

ঘোড়া ধীরে ধীরে চলতে সুরু করলো। সমবেত জনতা তো অবাক। কে এই তরুণ?

মাঠটা পুরো গিয়ে বেণী এবার ঘোড়া ফেরালো। বরাবর সুলতানের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামলো। ঘোড়ার গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে একবার আদর করলো, তারপর ঘোড়ার রাশ ধরে সুলতানের সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো—এ তো দুষ্টু ঘোড়া নয় হুজুর! জিনটায় দোষ ছিল, পেটে লাগছিল তাই গোলমাল করছিল।

সুলতান বললেন—তুমি তো ঘোড়া সম্পর্কে খুব অভিজ্ঞ, এ বিদ্যা তুমি শিখলে কোথায়?

—ঘোড়ার ব্যাপারটা আমার বাবা খুব ভাল বুঝতেন। বাবার কাছেই আমি সব শিখেছি। আগের সুলতান—আপনার পিতৃদেব নতুন ঘোড়া কেনা-কাটার সময় তাঁকে ডাকতেন।

—আমি তোমাকে আজ থেকে আমার অশ্বশালা দেখা-শোনার ভার দিলাম।

—আপনি আদেশ করলে আমি অবশ্যই দেখবো কিন্তু এজন্য কোন বেতন নিতে পারবো না। আমি গোবিন্দজীর পুরোহিতের বংশে জন্মেছি, দাসত্ব করতে পারবো না।

—সুলতান হাসলেন। বুঝলেন—এই হিন্দু ব্রাহ্মণ কুমার যবনের দাস হবে না। বললেন—বেশ, তোমাকে আমি একশো টাকা ইনাম দিলাম। আর এই ঘোড়াটাও দিলাম। তোমার সুবিধামত তুমি দিনে একবার অশ্বশালাটা দেখে আসবে। তোমার যে নজর আছে তা অনেক পাকা সইসের নেই।

বেণী কুর্নিশ করলো। পার্ষদরা সাড়া তুললো—সাবস্!

সুলতান রক্ষী ও পার্ষদের নিয়ে চলে গেলেন। মুস্কিলে পড়লো বেণী। জনতা তাকে ভাল করে দেখার জন্য ঘিরে ধরলো। শেষ অবধি বেণীকে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসতে হলো। অমন লাফানো

দুর্দান্ত ঘোড়া এখন দিব্যি ধীর কদমে ভীড় কাটিয়ে চললো। যারা চিনতো না তারাও আজ বেণীকে চিনে ফেললে।

॥ তিন ॥

বেণী ছিল একা, উদাসী। ঘোড়া পেয়ে তার এক উপসর্গ জুটলো। ঘোড়াকে আহার্য্য দিতে হবে।—ঘোড়ার পরিচর্য্যা করতে হবে। এসব কর্মে কোন দিনই সে অভ্যস্ত নয়। বাড়ীর পিছনে মস্ত বাগান আছে সেই বাগানে ঘোড়াটিকে সে ছেড়ে দিল। পরদিন সুলতানের দরবারে গিয়ে বললো—হুজুর, ঘোড়া দিয়েছেন কিন্তু ঘোড়ার খোরাক যোগাড় করাই তো আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমি তো নিঃস্ব, দস্যুরা আমার সর্বস্ব লুঠে নিয়ে গেছে।

সুলতান বললেন—বেশ, আমার অশ্বশালা থেকে নিয়মিত তোমার ঘোড়ার আহার্য্য ও পরিচর্য্যার ব্যবস্থা হবে।

সুলতান তখনই অশ্বপালকে যথা কর্তব্য নির্দেশ দিলেন। বেণী নিশ্চিন্ত মনে সুলতানের অশ্বশালা পরিদর্শনে চলে গেল।

দুর্গের এক প্রান্তে বিস্তৃত প্রাঙ্গণের শেষে রাজকীয় অশ্বশালা। দুর্গমধ্যে হাজার খানেক রক্ষী আছে, তাদের জন্য প্রায় বারো শো ঘোড়া এখানে আছে। দীর্ঘ আস্তাবল-বাড়ী, সামনে খুঁটির পর খুঁটি রশি দিয়ে যুক্ত করা, সেই রশিতে সারি সারি ঘোড়ার মুখ বাঁধা। কালো, খয়রা, সাদা ঘোড়ার সারি। বিচুলির আঁটি দিয়ে সইসরা দলাই-মলাই করছে।

একসঙ্গে এতো ঘোড়া বেণী কখনো দেখে নি। অশ্বারোহীদের কুচকাওয়াজ সে দেখেছে, কিন্তু এমন ভাবে সেই সব ঘোড়া রাখার কথা সে কখনো ভাবে নি। রাজকীয় ব্যাপার সব কিছুই কি বিরাট, সেই কথাটাই সে ভাবতে লাগলো।

কালকের সেই ঘোড়া-জেতা ছেলেটা আজ অশ্বশালা দেখতে এসেছে। সহিসেরা বিস্ময়ে ও কৌতুকে তাকে দেখতে লাগলো, বিশেষ গুরুত্ব দিল না।

ফেরার সময় অশ্বপাল একটি লোককে নির্দেশ দিলেন—দু' বালতী ছোলা নিয়ে যাও বাবুর সঙ্গে, বাবুর ঘোড়া খাবে। রোজ নিয়ে যাবে। সুলতানের হুকুম আছে।

ভৃত্যটি ভিজে ছোলার দু'টি বালতী দু-হাতে নিয়ে বেণীর অনুসরণ করলো।

বীরু চট্টোপাধ্যায়

ইংরেজীতে একটি প্রচলিত কথা আছে: 'অ্যাজ মার্সিলেস্ অ্যাজ এ শার্ক'—অর্থাৎ 'হাঙরের মতই নিষ্ঠুর!'

কথাটা যথার্থই বর্ণে বর্ণে সত্যি। এই জলদানব সদৃশ হাঙরদের মত নিষ্ঠুর হিংস্র ও বদ প্রকৃতির জীব এ দুনিয়ায় বুঝি প্রকৃতই বিরল।

জন্মের পর থেকেই এই জল-জন্তুগুলি অসহ্য ক্ষুধার তাড়নায় কী খাই—কী খাই, কাকে খাই কাকে খাই করে দিগবিদিক সমুদ্রে হাজার হাজার মাইল যেন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। যা কিছু সামনে পায় তাতেই কামড় কসায়। সে কামড়ও সাংঘাতিক অব্যর্থ কামড়! অজস্র ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ দংস্ট্রাবলী দিয়ে যাকে ধরবে তার আর রক্ষা নেই। এই কারণে সমুদ্রে চলা নাবিকদের সর্বাধিক ঘৃণার পাত্র ও শত্রু হ'ল এই হাঙরেরা।

আমাদের দেশে একটি কথা আছে, যে কেউ হয়ত নদীতে স্নান করছে—এক সময় তীরে উঠতে গিয়ে সে দেখল, তার একটি ঠ্যাং নেই। এমনি নিঃশব্দে ও নিঃশ্বারে হাঙরে কামড়ে কেটে নিয়ে গেছে পা-টা যে মানুষটা আদৌ তা টের পায় নি।

কথাটা যে একটু অতিরঞ্জিত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে অনেকাংশে সত্যি—এমনি মোক্ষম কামড়ই হাঙরের।

বেশ কিছুকাল আগে কলকাতায় গঙ্গায় একাধিক নানা আকারের হাঙর ধরা পড়ে। এবং যাঁর হাতে ধরা পড়ে তাঁর নাম, ভগবান। আমরা রসিকতা করে বলতাম—ভগবানের হাতেই ধরা এবং মারা পড়ছে ব্যাটা হাঙরেরা।

এই আজব ভয়ংকর হিংস্র জল-জন্তুদের লোমহর্ষক আচার-আচরণ শুনলে, ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়।

বিশ্বের সমুদ্রের এক এক অঞ্চলে হাঙরদের প্রাচুর্য দেখা যায়।

আফ্রিকার ডারবান শহরের উপকূল তেমনি একটি স্থান। এখানে তিমি শিকার হয়ে কারখানা জাত নানাবিধ বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। তিমি-দেহের নানা অংশ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় আশে-পাশের সব হাঙরেরা এখানে এসে কিলবিল করে। এরা যা পায় তাই খায়, এমন কি নৌকোর বৈঠা থেকে তার আরোহী সব কিছুকেই এরা টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবার চেষ্টা করে। এখানে বহু শিকারী বড়শী দিয়ে হাঙর শিকার করে।

উক্ত ডারবান উপকূলে একটি ছোট ছেলের অসম সাহসীকতাপুর্ণ পরম আশ্চর্য ঘটনা দেখে ওখানকার শিকারীরা তাজ্জব হয়ে যেতো।

মাত্র এক আনা পয়সার বিনিময়ে বালকটি তেলের ড্রাম দিয়ে তৈরী একটি ভেলায় চড়ে সে হাঙর শিকারীদের দড়ি-বাঁধা বড়শী নিয়ে তাদের নির্দেশ মত কিলবিল করা হাঙর-ভরা সমুদ্রের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে ফেলে আসত।

অলৌকিক কাণ্ড, অকল্পনীয় হিংস্র হাঙরেরা বালকটিকে কিছু করত না। কেন করত না কে জানে? ওকে জিজ্ঞেস করলে হেসে উত্তর দিত, হাঙরেরা আমায় কিছু করবে না, বা-স্ (হুজুর), ওরা আমায় ভালবাসে।

এমনি অলৌকিক ক্ষমতা কিছু কিছু আফ্রিকার লোকেদের মধ্যে দেখা যায়। একবার দেখা গেল দু'জন নাবিক একটা লঞ্চের ধারে জলে পা ঝুলিয়ে বসে জলযোগ করছে। এমন সময় সেখানে কয়েকটি বিশালকায় হাঙরের মুখ ও লেজ দেখা গেল। দু'টি নাবিক কিন্তু এতটুকু ভয় পেল না, গ্রাহ্যের মধ্যে আনলো না ঐ হিংস্র কালান্তক সম জল-দৈত্যদের। তেমনি ঝোলানো পা দুলিয়ে দুলিয়ে খেতে লাগলো আর হাসাহাসি করে নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করতে থাকলো। আর আশ্চর্য, দেখা গেল কিছুক্ষণের মধ্যে সেই হাঙরের দল কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

অবশ্য এ ধরণের 'গুণী'জন তো সবাই নয়। সাধারণ মানুষেরা এদের সভয়ে এড়িয়ে চলে এরা সাক্ষাৎ যম।

আফ্রিকার উপকূলেই একদা দু'জন সাহেব কোমর জলে দাঁড়িয়ে স্নান করছিল। সহসা একজন আর্তনাদ করে উঠলো। তাকে ডাঙায় তোলাতে দেখা গেল পায়ের এক খাবলা মাংস কেটে নিয়ে গেছে ছোট কোন এক হাঙর।

এই ছোট আকারের এক জাতীয় হাঙরের হিংস্রতাই সর্বাধিক।

জাপানের মাউ বন্দরে এক জাপানী জেলে ডুব দিয়ে জলের তলার জাল থেকে মাছ তুলতে গিয়ে এক ছোট হাঙরের পাল্লায় পড়ে। হাত দেড়েক সেই হাঙর বাচ্চা চোখের পলকে বার বার আক্রমন করে পালোয়ান সদৃশ সেই জাপানী জেলের দেহের দশ জায়গা থেকে মাংসের ডেলা তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে মেরে ফেলে।

হাঙর আক্রান্ত পলিনেশিয়ার দ্বীপবাসী ও তাদের উলটে যাওয়া ক্যানো (নৌকা)।

একজন ডুবুরি বলে, যে বড় হাঙরেরা শব্দ শুনলে ভয়ে পালায়। সেই ডুবুরি নাকি জলের তলায় একটা চোঙার সাহায্যে উদ্ভট শব্দ করে বড় বড় হাঙরদের তাড়িয়ে নিজের কাজ হাসিল করত।

সব হাঙরই সমান উগ্র নয়। কতকগুলো জাত আছে খুবই ভয়ংকর স্বভাবের।

নাবিকদের মধ্যে একটা অন্ধ-বিশ্বাস আছে, যে হাঙরেরা পূর্বেই 'মৃত্যুর' সংবাদ পায়। তাদের

মতে যে জাহাজের পেছন পেছন হাঙররা ধাওয়া করে চলে, সে জাহাজে অবশ্যই কেউ মারা যাবে তখন তাকে জলে ফেলে দিলে সেই মৃতদেহ মজা করে ও-ব্যাটারা খায়। বৈজ্ঞানিক মতে অবশ্য তা নয়। আসলে ওদের শ্রবণশক্তি খুবই প্রখর। বহুদূর থেকে জাহাজের প্রপেলারের শব্দ শুনে জাহাজের কাছে এসে যায় এবং জাহাজ থেকে যে তেল ও ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য প্রভৃতি জলে পড়ে তা খেতে খেতে জাহাজটাকে অনুসরণ করে।

আগেই বলা হয়েছে এরা সর্বভূক। এদের পেট চিরে যে যে বস্তু পাওয়া গেছে তার তালিকা শুনলে অবাক হতে হয়। পেট থেকে পাওয়া গেছে—মরচে পড়া একটা অ্যালার্ম ঘড়ি, সোনার হাতঘড়ি (মালিক তরুণটি ইংলণ্ডের উপকূলে জাহাজ থেকে জলে পড়ে গিয়েছিল, তাকে আর পাওয়া যায় নি)। মাংসের কৌটো, পেট্রলের টিন, নানারকম শাকশব্জি, ফলমূল, একটা আস্ত শূকরছানা। বিরাট একটা থলে, এক ঝুড়ি কচ্ছপের শক্ত পিঠ, ঘোড়ার আস্ত একটা ঠ্যাং, সেই পায়ে তখনো লোহার খুর ঝক ঝক করছিল। খাওয়ার অল্প সময়ের মধ্যে ধরা পড়াতেই এ বস্তুগুলো পাওয়া গেছে। নয়ত ওদের যা অবিশ্বাস্য হজমশক্তি, দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু পেটে পড়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হজম হয়ে বিলীন হয়ে যায়।

এই কারণে ক্ষুধারও ওদের সীমা নেই।

পেট চিরে সবচেয়ে ভয়াবহ বস্তু পাওয়া গিয়েছিল আস্ত একটা মানুষের মাথা—অবিকৃত মাথা।

ঘটনাটা ঘটেছিল ঐ ডারবান বন্দরেই। একটা স্টিমার বন্দরে ঢোকবার মুখে অকস্মাৎ একজন নাবিক জলে পড়ে যায় এবং অদৃশ্য হয়ে যায়।

এর কিছুক্ষণ বাদে পাশেই নোঙর করা একটা স্টিমার থেকে জনৈক লোক বড়শী দিয়ে একটা হাঙর ধরে। তার পেট চিরেই উক্ত মুণ্ডুটি বের হয়। সম্পূর্ণ অবিকৃত মুণ্ড। চেনা যায় স্পষ্ট। এমন কি তার সৌখিন গোঁফটি পর্যন্ত তেমনি আছে।

অস্ট্রেলিয়ার সিডনীর এক কসাইখানার জন্তু-জানোয়ারের দেহাবশিষ্টগুলি সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে কাছাকাছি সমুদ্রে সাংঘাতিক হাঙরের উপদ্রব। ওখানে একবার ভুলে একটি যুবক সাঁতার কাটতে যায়। তৎক্ষণাৎ হাঙরের আক্রমণে একে একে হাত-পা হারিয়ে, পরে টুকরো টুকরো হয়ে তাদের পেটে ঢুকে গিয়ে প্রাণ হারায়।

হিংস্র হাঙরদের আরেকটি আড্ডা হ'ল সলোমন দীপপুঞ্জ। এর কারণ হ'ল ওখানকার অধীবাসীরা তাদের মৃতদেহ সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করে থাকে। এরই লোভে ওখানে ক্ষুধার্ত হাঙরদের যেন মেলা বসে গেছে।

একবার মানুষের মাংসের স্বাদ পেলে ওরা যেন ক্ষেপে যায়। আর ক্ষিধেরও শেষ নেই। একদা জনৈক নাবিক একটা হাঙর ধরে সেটার পেট চিরে নাড়িভুড়ি বের করে নিয়ে এক সঙ্গে হাঙর ও

নাড়িভূড়ি সমুদ্রে ফেলে দেয়। বিস্মিত হয়ে নাবিকটি দেখে যে, সম্পূর্ণ নিস্তেজ হয়ে প্রাণ হারিয়ে সমুদ্রতলে ডুবে যাবার আগে সেই হাঙরটা তার নিজের নাড়িভুড়িই জল থেকে খেয়ে নিল।

ওদের দানবীয় ক্ষুধার আরেকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় জনৈক আমেরিকানের কাছ থেকে। তার নিজস্ব সংগ্রহের চৌদ্দফুট দৈর্ঘের এক হাঙরকে সে আস্ত একটি ছাগল খাওয়ায়। পরক্ষণে দুর্ঘটনা বশত একটা চায়ের পেটির মত কাঠের বাস্ক পড়ে যায় জলে। অমনি চোখের পলকে সেই বাস্ক মুখে নিয়ে হাঙরটা নিমেষে গুঁড়িয়ে গিলে ফেলে। বাস্কটা যেন ডিমের খোলা।

কতকগুলো হাঙর আবার দিনে অকর্মণ্য অবস্থায় থাকে। রাত্তির হলেই দেখা যায় তাদের সিংহ মূর্তি। নিশাচর হাঙর।

জলের তলায় ভ্রমণরত জলদানব (ক্ষুদ্রকার দু'টি ডগ ফিস)।

ইতিহাসে ভয়াবহ হাঙর আক্রমণ ঘটে পলিনেশিয়ার এক দ্বীপে। একদা কয়েকটা ক্যানোতে (নৌকায়) করে স্থানীয় বিয়াল্লিশজন অধীবাসী এক দ্বীপ থেকে অরেক দ্বীপে যাচ্ছিল।

সমুদ্রে কিছুদূর যাবার পরই শুরু হ'ল ভয়াবহ আক্রমণ। কোথা থেকে শত শত হাঙর এসে প্রথমে নৌকোর বৈঠা কামড়ে নিতে লাগলো। একটা বিশালকায় জন্তু এসে এমন ধাক্কা দিল যে ছোট এক ক্যানো উলটে গেল। যাত্রীরা পড়লো জলে। তারপর ভয়ংঙ্কর দৃশ্য। অন্তিম আর্ত চীৎকার, রক্তে রক্তে জল লাল হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কয়েকটি মানুষ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে ওদের পেটে চলে গেল। এর পর যেন হাঙরেরা আরও বেশী উন্মত্ত হয়ে উঠল। নর মাংসের স্বাদ পেয়ে ভয়ানক ক্ষেপে গেল দানবেরা। প্রতিটি নৌকোর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে বিয়াল্লিশজন নর-নারীর মধ্যে চল্লিশ জনকেই হত্যা করে তারা খেয়ে ফেলে দিল। মাত্র দু'জন ক্ষত-বিক্ষত দেহে কোনক্রমে তীরে ফিরে এসেছিল এই ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী হয়ে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ফিজি দ্বীপের অদূরে। বড় একটা নৌকোয় কুড়িজন মাল্লা চলেছিল। অতর্কিতে হাঙরের পালের মধ্যে পড়ে সমস্ত লোক এবং নৌকোর আধাআধি অংশ জলদানবদের পেটে চলে যায়।

যে সব মানুষ এদের আক্রমণের আওতায় এসেছে তাদের ঘৃণা সর্বাধিক এদের প্রতি। তাই দেখা যায় মাংসের সঙ্গে ডিনামাইট জুড়ে এদের খাইয়ে শেষ করা হয়। কখনো দেহের পেছনের আধাআধি কেটে দিয়ে অসহায় ভাবে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়, যাতে অপরাপর স্বজাতিরাই ওদের খেয়ে ফেলে। পাথর বেঁধে ডুবিয়ে দেওয়া হয় ওদের। কিংবা হাঁ করিয়ে লোহার শিক ঢুকিয়ে জলে ফেলে দেয়, যাতে অনাহারে মারা পড়ে।

এগুলো ভাল নয়। এও নিষ্ঠুরতা। তবুও এ দুনিয়ায় ভূচর, খেচর, মশা, মাছি, কীট-পতঙ্গ, জন্তু-জানোয়ার এবং জলচরদের মধ্যে এই ধূসরাকৃতি জলজ নেকড়েদের মত এত জঘন্য হিংস্র প্রাণী আর দ্বিতীয়টি নেই। অতএব দুষ্টের প্রতি দুষ্ট ব্যবহার, হিংস্রের প্রতি হিংস্রতা দেখালে তাদের তেমন দোষারোপ করা যায় কী?

প্রণাম করি

ক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিক

অমারাতের মৌনী কারায় বন্দী যারা, দেশের হিতে
অমূল্য প্রাণ দেয় বলিদান কুণ্ঠাবিহীন কনক-চিতে,
ভাঙ্গলো যারা কঠিন নিগড় কঠোর শাসন নিত্য সহি,
রক্তঝরা বুকের দানে আজকে যারা মৃত্যু-জয়ী,
দুস্থা মায়ের সেবা যারা করল সারা জীবন ধরি';
যুক্তকরে আবেগভরে এসো তাদের প্রণাম করি।

দু'হাত ভ'রে জানে যারা হৃদয়-বিভব বিলিয়ে দিতে,
অগ্নি-খর বুলেট-মুখে ঝাঁপায় যারা ফাঁসিতে,
মৃত্যু যাদের ভৃত্য পায়ের, পরাণ-কুসুম পূজার ডালি,
মুক্তি-পথের মূল বেদীতে পেলব পরাগ হেলায় ঢালি'
স্বাধীনতার শহীদ যারা কাঁটার মুকুট হাস্যে বরি',
যুক্তকরে আবেগভরে এসো তাদের প্রণাম করি।

শ্রীশৈল চক্রবর্তী

বলবি ত! না বললে বুঝবো কি করে বল। আমি কি তোর পেটের মধ্যে ঢুকবো?

সেজমামী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন।

আমরা সবাই খেতে বসেছি। মামী পরিবেশন কচ্ছেন। আমার পাতে বড় হাতার এক হাতা লাউ ঢেলে দিয়েছেন হঠাৎ আর আমি লাফিয়ে উঠেছি।

উনি লাউ ছোঁবেন না। তা আমায় বলবে ত! আমি কি হাত গুণবো? দেখ দেখি তরকারীটা নষ্ট হ'ল।

তা মামী তোমার ঐ জ্যোতিষী বিদ্যেটা জানা দরকার। আমি নুনের ছিটে দিই মামীর কাটা ঘায়ে।

হ্যাঁ, ঐটেই বাকী আছে, বললেন মামী।

আমি বললুম, দেখ না। তাহলে আমার পাতে লাউএর বদলে চিংড়ির মালাইকারী পড়ত ডবোল করে। তোমার হাতে ঐ জিনিসটা যা উৎরোয়! ওফ্!

আমার কথায় মামী খুশি হয়েছেন মনে হ'ল।

কি করে জানবো বল তুই আসবি আজ। আর ভাল চিংড়ি কি ছাই সব দিন পাওয়া যায়?

শিপু ত হাত গুণে বলতে পারতিস। আমি আসছি, শিপুর দিকে কটাক্ষ করি এবার। শিপু ওরফে শিপ্রা দেবী আমার মামাত বোন।

কেন? তুমিও ত হাত গুণে আসতে পারতে ঠিক যেদিন আমাদের বাড়ি ইয়া বড় চিংড়ি মাছ আসে, মুখ খুলল শিপু।

ঢালাউ লাউ-ঝোল খাওয়ার পর আমরা যখন বারান্দায় জমায়েত হলাম। আমাদের প্রথম কথাটাই হল—কেউ যদি সত্যি অন্যের মনের কথা জানতে পারত!

শিপুই পাড়ল কথাটা।

আমি বললুম, কেন পারবে না! তুমিও পারবে বৎসে! বিয়ের পর মেয়েরা জানতে পারে। অবশ্য একজনের মনের কথা—

কার?

সে ভাগ্যবান যে কে হবে তা বলা শক্ত অবশ্যি!

যাও!

তিনমাস পরে কলেজের ছুটি। আমি আবার গেছি কলকাতায় মামার বাড়ি। অবশ্য শিপুর চিঠি পেয়েছিলুম।

আমাকে দেখেই শিপু বলে উঠল, আজ বাড়িতে গলদা চিংড়ি ও বটুদা দুই-ই উপস্থিত।

তাহলে যোগাযোগটা রাজজোটক বলছিস?

হ্যাঁ, তাই ত দেখছি। বটুদা, তোমার ঐ পামিস্ট্রীর বইটা দাও ত। অন্য কথা পাড়ল শিপু।

পামিস্ট্রী না কেমিস্ট্রী? আমি একটু অবাক হয়েই বলি। সত্যিই আমি অন্য বইএর সঙ্গে হাত দেখার বইটা এনেছিলুম। খবরের কাগজের মোড়ক ভেদ করে তিন গজ দূর থেকে ও বুঝল কি করে? আশ্চর্য ত!

তোমার মুখ দেখেই বোঝা যায় তুমি হাত দেখা চর্চা করছ, অবলীলাক্রমে বলে গেল ও।

তাই বুঝি?

মোড়ক খুলে হস্তরেখার নানা চিত্র অলঙ্কৃত কিরোর বইটা হস্তান্তর করলুম। সত্যি কথা কি, আমি হাতের রেখা পড়বার কসরৎ করছিলুম কিছুদিন ধরে। তাই কিরোর বইটা কিনেছিলুম 'দি ল্যাংগোয়েজ অব্ দি হ্যাণ্ড।' যদি কিছু শেখা যায়।

কিন্তু ঐ ল্যাংগোয়েজের ধরণ-ধারণই আলাদা। গ্রীক, লাটিনকেও হার মানায় ঐ ভাষা। ওর বর্ণপরিচয় হওয়াও দুঃসাধ্য। হাত মেললেই জালের মত ঐ যে রেখার জটাজাল, মাকড়শার জালও বলা যায়। নানা জটিলতায় হাতের তালুতে মুদ্রিত হয়ে আছে। তা থেকে কোনো অর্থ উদ্ধার করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। সরল, বঙ্কিম কত রেখা—রেখার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জীবনের কত পরিচ্ছেদ! ভাগ্যের লুকোচুরি খেলার যেন গড়ের মাঠ! ভাগ্য-বিড়ম্বনার সঙ্গে আমিও বিড়ম্বিত হয়ে উঠি পড়তে গিয়ে। প্রচ্ছদপটেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

দেখ দেখি আমার হাতখানা। শিপু তার হাতখানা চিতিয়ে ধরে আমার নাকের ডগায়।

আমিও সেটা করতলগত করতে দ্বিধা করি না। বিজ্ঞোচিতভাবে দেখতে থাকি।

দেখব না কেন? তোকে দেখছি, আর তোর হাত দেখব না?

বল দেখি, কি দেখছ? করতল মালিকের প্রশ্ন।

মন্দ নয়···বেশ পাঁচটা আঙ্গুল আছে দেখছি···বেশ হৃষ্টপুষ্টও বটে—

ফাজলামি রাখ। কিছু পড়তে পারছ কিনা তাই বল।

যথেষ্ট পাচ্ছি। পারব না কেন? পষ্ট লেখা সব জ্বল জ্বল করছে। তবে একটু কাটাকুটি আছে মনে হচ্ছে।

ছাড়ো, আর দেখতে হবে না। বলে ওঠে শিপু। কিন্তু হস্তোদ্ধারে তার যথেষ্ট গড়িমিসি দেখা যায়।

দাঁড়া, আরো অনেক বলবার আছে। পঠিতব্য কত কি রয়েছে—আচ্ছা, তোর মনটা সব সময় আঁকু-পাঁকু করে কি?

বয়ে গেছে করতে।

আচ্ছা, তুই যা চেয়ে চেয়ে যাচ্ছিস তা ঠিক পেয়ে পেয়ে যাচ্ছিস না—ঠিক নয়?

ছাই! ওরকম বলতে পারে সবাই। বল দেখি আজ কি পেয়েছি?

পেয়েছিস? আজকেই?

মনে মনে বিস্তর হাতড়ে বেড়াই। কি পেতে পারে আমার বোন শিপ্রা দেবী, ক্লাস নাইনের ছাত্রী? শাড়ি, জামা, গয়না, প্রেজেন্ট?

আমাকে গবেষণারত দেখে হাতটা আমার অধিকার থেকে অপসারিত করে বললে—থাক, অত ভাবলে হয় না। অত সহজে হয় না মশাই! চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক। তার আগে তোমায় একটু চা খাইয়ে দিই।

চা না, যদি এক কাপ কফি দিস—

কফিটা নিঃশেষ করে দু'জনে বেরিয়ে পড়লুম। শহরে এসেছি তিন মাস পরে। ছুটি পেলেই

মামাবাড়ি আসি। এসেই ছুটোছুটি করি—হয় লেকে, নয় গড়ের মাঠে। সিনেমার দরজায় ভিড় করতেও বেশ লাগে। কোন্ হাউসে কোন্ ছবি হচ্ছে তার ফর্দ কণ্ঠস্থ করে ফেলি।

দু'জনে যাচ্ছি। শহরের রাস্তাঘাট আমার কাছে প্রায় রূপকথার দেশের মত লাগে। হরেক কিসিম জাতের লোক কেমন গাদাগাদি করে বাস করে এখানে। গলি ঘুঁজি কোথাও বাদ নেই। কত রকম কাজের তাগিদে ঘুরছে সবাই। নামাবলির পাশে হ্যাটকোট, টাই? সালোয়ার-পাঞ্জাবীর পাশে শাড়ির পুঁটলি, পুরুত ঠাকুরের পাশে গাঁটকাটা। সবাই ঘুরছে আর ছুটছে! হরেক রকমের ফেরিওলা। কি ডাক তাদের, কেমন সুরেলা ছন্দে হাঁক দেয় তারা। বোঝবার উপায় নেই জুতো-সেলাই না, শিলকাটা। ফুলঝাড়ু না, নতুন গুড়ের মোয়া।

চল না একটু কিছু খাওয়া যাক, শিপুর প্রস্তাব।

চল, কি খাবি?

পকেটে কত আছে বল। আছে ত মোটে আড়াই টাকা।

অ্যাঁ, কক্ষণো নয়।

মনে মনে কিন্তু ভাবলুম ঠিকই বলেছে শিপু। আর এই রেস্ত নিয়ে স—শিপু ভাল রেঁস্তোরায় ঢোকা উচিত হবে না। কারী, কোর্মার ঢালাও অর্ডার দিলেই ত গেছি!

চল, তার চেয়ে দু'গ্লাস গ্রীন ম্যাঙ্গো ঘোলের সরবৎ খাওয়া যাক। বলে শিপু একটা সরবতের দোকানের দিকে পা বাড়াল। তুমি যখন একান্তই ভাবছ রেঁস্তোরায় ঢোকা উচিত হবে না, তখন এই ভাল—

কক্ষণো তা ভাবি নি, প্রতিবাদ করি আমি।

আমি মুখ দেখলেই বুঝতে পারি। মোনালিসার হাসি হেসে বললে শিপু। আরও বলছি, তুমি এইমাত্র ভাবছিলে, 'তার চেয়ে, সিনেমায় গেলে হ'ল ম্যাটিনি শোয়ে'—সত্যি কি না?

তা প্রায় ঠিকই বলেছিস? স্বীকার করতে হয় অগত্যা আমাকে। মেয়েরা জ্যোতিষী বিদ্যে শিখেই জন্মায় কি না ভাবতে থাকি আমি।

আমি জ্যোতিষী কিনা ভাবছ—তাই না?

তোর কথা ভাবতে আমার বয়ে গেছে!

আমার কথা না হলেও মেয়েদের কথা ত!

তা কেন ভাবব না? মেয়েরা কি ভাবনার বাইরে?

দাদা!

হটাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শিপু।

কিরে, হ'ল কি?

দাঁড়াও, দাঁড়াও! ঐ লোকটাকে দেখছ?

হ্যাঁ। দেখছিই ত। ভদ্রলোক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তালা খুলছে বোধ হচ্ছে।

চাবি দিয়ে খোলবার চেষ্টা করছে, আর ভাবছে কি জান?

মরুক গে, যা খুশি ভাবুক। চল, গ্রীন ম্যাঙ্গো খাবি বলছিলি না?

ও ভাবছে কি জান? ভাবছে, আমরা ওকে সন্দেহ করছি কি না। ঐ, ঐত তালাটা খুলে ফেলল। আসলে ওর মতলবটা ভাল নয় কিন্তু!

কি করে জানলি?

ওর মুখ দেখে বুঝতে পেরেছি! এ বাড়িটা কিন্তু ওর নয়।

অ্যাঁ, তবে কি বলতে চাস লোকটা চোর? যাঃ, আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। বেশ দামী সার্ট পরেছে দেখছি। পেন্টুলটাও মন্দ নয়। চেহারা ভারিক্কি গোছের ঠোঁটের ওপর অবশ্য ছাঁটা গোঁফ—যাই বলিস তার জন্যে অত সন্দেহ করার কিছু নেই।

না, তুমি বুঝতে পারছ না। এ বাড়িতে ও ঢুকেছে অন্য মতলবে। বেশ বুঝতে পারছি, ও ভাবছে, এগারোটা ছত্রিস মিনিটের সময় টেম্পোটা আসবে। তাতেই মালগুলো তুলবে সেইটাই ভাবছে এখন। চল, এক্ষুনি চল, আমরাও ঢুকে পড়ি।

শিপুর নেতৃত্বে বশম্বদশিষ্যের মত আমিও চললুম। কিন্তু ঢুকব কি? লোকটি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে যে।

শিপু ছাড়বার পাত্রী নয়। সে দরজায় টোকা মারছে, ঘন-ঘন টোকা……করাঘাতের পরবর্তী প্রচেষ্টা হ'ল চীৎকার, খোলো খোলো দ্বার।

কি জন্যে জানি না, দরজা হঠাৎ খুলে গেল এবং সেই ছাঁটা গোঁফ ভদ্রলোক আমাদের সামনে।

কি চাই তোমাদের? আমাকেই জিগ্যেস করল সে।

কিন্তু আমি কি চাই তাত ঠিক জানি না। তাই গুঁই-গাঁই করতে থাকি।

আমরা একটা কথা জানতে চাই, শিপুই খোলসা করল।

কি বলে ফেল! যেন ব্যাঙ ডেকে উঠল। তাড়াতাড়ি চটপঠ বলে ফেল।

এ বাড়িতে আপনি ঢুকেছেন কেন?

হিশ্‌হিশিয়ে অদ্ভুত হাসি হেসে উঠল লোকটি। আওয়াজ নেই অথচ বিলম্বিত তারপর বললে, আমার বাড়িতে আমি ঢুকেছি, তার জন্যে তোমাদের মাথা ব্যথা কেন? তোমাদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি? এ কোনদিশি আবদার? যাও, বাছাধনরা সরে পড় এখান থেকে।

কিছুতেই না, শিপু জবাব দেয়। তার মাথায় কি যে জেদ চেপেছে সেই জানে।

চল শিপু, আমরা কেটে পড়ি, আমি জানাই। এ ঝামেলায় বিজড়িত হ'তে আমার ঘোরতর আপত্তি। একজনের বাড়িতে ট্রেসপাস করা মোটেই ভদ্রোচিত নয়।

এমন সময় ভট্ ভট্ ক'রে একটা টেম্পো এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। গৃহস্বামীকে আরো বিচলিত হ'তে দেখা গেল এবং সেই সঙ্গে শিপুকেও।

তোমরা এখান থেকে নড়বে কি না? কাজের সময় এক ভদ্রলোককে বিরক্ত করা এটা কি নাকি হে ছোকরা?

আমাকে উদ্দেশ্য করেই সে কথাগুলো উচ্চারণ করল।

যদি সহজে না নড়, তাহলে আমার এই হাত দুটোই কাজে লাগাতে হবে, বলে দিচ্ছি। আগাছার মত এখানে ভিড় করবে না পথ দেখবে? সাফ জবাব চাই!

আগাছা আখ্যায় আমার মেজাজটা চটে গিয়েছিল। কিন্তু একটু কায়দা করেই উত্তর দিলুম! আমি বলি আপনি কাজ করুন না, আমরা শুধু দেখব। ব'লেন ত আমরাও হাত লাগাতে পারব। যদি ভারিভুরি কাজ না হয় অবশ্য।

হাত লাগাবে? খেঁকিয়ে উঠল ভদ্রলোক। দেখি সোনার চাঁদের হাতখানা!

বলেই সে আমার হাতখানা প্রায় ছিনিয়ে নিয়েছে তার হাতে এবং তারপর বাগিয়ে ধরে ঝাঁকুনি দিয়েছে। তারপর ধাক্কায় ধাক্কায় আমাকে একেবারে রাস্তায় এনে হাজির করেছে। এর পরে ফিরে গিয়ে আস্তিন গুটিয়ে বিড় বিড় করে বলে, এবার আর একটাকে—

টেম্পো থেকে একজন নামছে দেখে আমার টেম্পারেচার যেন বেড়ে গেল। প্রমাদ গণি আমি। কী কুক্ষণেই শিপুকে নিয়ে পথে পা বাড়িয়েছিলুম! বরাত জোর বলতে হবে, সেই সময়ই এক কনষ্টেবল যাচ্ছিল পথ দিয়ে হয়ত ডিউটিতে যোগ দিতে।

ক্যা হুয়া? থমকে দাঁড়িয়ে বললে সে। আমার ওপর বল প্রয়োগের দৃশ্যটা তার দৃষ্টি গোচর হয়েছিল।

শিপুকে বহিষ্কার করার চেষ্টায় লোকটি তখন কসরৎ করছে। পিছনে পুলিশকে দেখেই বেশ চোস্ত হিন্দীতে সে বাৎলায় দেখিয়ে কনষ্টবলজী, মেরা কুঠিমে দো ডাকু ঘুষা হ্যায়, কোই চোরিকা মতলব হ্যায় জরুর—হঠ্ নে নেই মাংতা—

কনষ্টেবল আমাদের আপাদমস্তক একবার দেখল। তার পর ওদের পেশাগত ভাষায় জেরা শুরু করে, আপকা ক্যা কাম আছে হিঁয়েপর?

কুছ নেহি, আমি প্রাঞ্জল করতে যাই, কাম কুছনেই, আমরা পথিক-'cumদর্শক মাত্র।'

তবে ছোড়িয়ে দিন, টিরেস্পাশকা কানুন আগে, জানেন কি?

লোকটা মোটেই ভাল নয়! শিপু মন্তব্য করে এতক্ষণে।

হাঁ হাঁ, দুনিয়ামে ভালো খারাব দুনোই হ্যায়। আপলোক খারাব কি ভালো, কইসে মালুম হোগা? যাইয়ে, বাহার যাইয়ে—বাড়িওয়ালা সবকোইকো খাতির নেহি করে।

আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারওলাজীর হিতোপদেশ শুনছি ইত্যাবসরে ছাঁটা গোঁফ বাড়িওলা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

আমিও তখন কি আর করি রাষ্ট্রভাষাকে অবলম্বন করে পাহারওলাজীর সঙ্গে বাতচিত করছি। শিপুর অস্ফুট মন্তব্যকে আরো প্রাঞ্জল করতে চাই।

দেখিয়ে কনষ্টেবলজী, আমি বলি, ইনি আমার বহিন শিপ্রা দেবী। উনি বলছিলেন কি ঐ লোকটা মানে আদমিটা ভাল নয়। কোনো খারাপ মতলব আছে উস্‌কো—তাই, উস্‌লিয়ে আমরা ত দেখ্‌তা থা—

দেখিয়ে বাবু, ছিপ্‌ড়া দেবী যো বোলা হ্যায় উতো সাচ্‌ বাৎ। লেকিন, কোই কোই বাড়িওলা এমন আসে কি? লোক দেখলে বাড়িতে ডাকে, চা খিলায়। মগর, কোই কোই এইসা আসে কি যে চিনাজানা লুক্‌কেভি বাহার করিয়ে দেয়—

আমি তখন শিপুকে নেপথ্যে বলে ফেলি, চল, অনর্থক কতক্ষণ সময় নষ্ট করলি দেখ দেখি! আমার গলা শুকিয়ে কাঠ মেরে গেল। আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। তোর মনো-পাঠ বিদ্যের পরীক্ষায় ফুলমার্ক পেলি না, কি হবে আর? পুনঃ পুনঃ চেষ্টা আর ভুয়োদর্শন দরকার তবেই না ভুয়ো জিনিস চিনতে শিখবি—

আমি কিন্তু—বলতে না বলতেই শিপু হঠাৎ থেকে গেল। ঐ দেখ দেখ, একটা রিক্সা আসছে না?

আসছেই ত। রিক্সা মানুষ ট্যাক্সি কি না আসছে?

তা বলছি না। রিক্সায় একটি মহিলা দেখেছ?

তোর চেনা-জানা না কি রে? তোর মাসীটাসী হবে নাকি? তোর ত মাসীর অন্ত নেই। নীলুমাসী লালুমাসী চীনেমাসী জাপানীমাসী—

কথোপকথন রত আমাদের সামনেই এবং ঐ অপয়া বাড়িটার সামনেই দাঁড়াল রিক্সাটা। নামলেন ভদ্রমহিলা। বিরাট চেহারা, আধহাত চওড়া লাল পাড় শাড়ি। হাতে রুমাল বাঁধা ছোট্ট পুঁটলি। দরজার সামনে দাঁড়ালেন তিনি তারপর চাবির গোছা নিয়ে তালায় করস্পর্শ করেই এক হাঁক ছাড়লেন, একি? তালা খোলা কেন? দরজা বন্ধ কেন?

আশে পাশে চোখ বুলিয়ে দেখে, আবার এক চিৎকার, একি এখানে পুলিশ কেন? তোমরা দাঁড়িয়ে এখানে কি দেখছ? ব্যাপারটা কি?

কনষ্টেবলজিই এগিয়ে এসে বলল, বাড়িওয়ালা এঁদের বাহার করিয়ে দিসেন, দরওয়াজাভি বন্ধ করিয়েছেন—

বাড়িওলা? ফেটে পড়লেন ভদ্রমহিলা। বাড়িওলা আবার কে? এ ত আমার বাড়ি। আমি গিয়েছিলুম কালীঘাটে, মার পুজো দিতে। দু'ঘণ্টা ও হয়নি। এইত আমার হাতে তালার চাবি। তালা খুলল কি করে? কে আছে ভেতরে?

পুলিশ তালাটা নেড়ে চেড়ে রায় দিল। মালুম হচ্ছে কে তালাটা টুটিয়েসে—

অ্যাঁ। সর্বনাশ! আকাশ-ফাটা ডাক ছাড়লেন ভদ্রমহিলা।

এ হাপনার নিজের বাড়ি আসে?

হ্যাঁ-গো হ্যাঁ! পলটুকে কলজের ভাত দিয়ে সবে গেছি আমি গঙ্গায় একটা ডুব দিতে—কি সব্বোনেশে কাণ্ড!

শিপু আমার আস্তিনে এমন একটা টিপুনি দিল যে আমি চমকে উঠেছি। বললে, দেখলে বটুদা—

আমিও যেন হাবা হয়ে যাই। ভ্যাবাচাকার মুখভঙ্গি করি শুধু।

কনষ্টেবলজির তৎপরতা দেখা গেল এবার। সে বললে, হাপনারা এখানে খাড়া থাকুন বক্তব হ'লে উহ আদমিকো পাকড় লিবেন। হামি পিছনসে যাবে, তাড়া দেবে। আউর কেই রক্ত আসে পিছনে?

না, ভদ্রমহিলা বলে ওঠেন। একটা পাঁচিল আছে গো—শিগগির যাও! কালী কলুষনাশিনী মা! একি সব্বোনাশ হল গো আমার!!

পাহারওলা বাড়ির কানাচে দিয়ে অদৃশ্য হলে আমি সান্ত্বনা দিই ভদ্রমহিলাকে, আপনি ঘাবড়াবেন না। আপনার কোন আত্মীয়ও ত আসতে পারেন। হয়ত হঠাৎ এসে পড়েছেন। পুঁটিয়ারি কিম্বা ঘুঘুডাঙ্গা থেকে।

আত্মীয় কে হবে? এক কুঞ্জকাকা আসতে পারেন। তাঁর পাতলা চেহারা, মাথার চুল সাদা। তা তিনি তালাই বা ভাঙবেন কেন?

নাঃ আমি বলি। এ আপনার কুঞ্জকাকার ধার দিয়েও যায় না। এর বেশ পুঞ্জীভূত চেহারা, ছাঁটা কালো গোঁফ।

ও বাবা! ভদ্রমহিলা শিউরে উঠেছেন।

ইত্যবসরে চোখের ওপর দিয়ে একটা নাটকীয় দৃশ্য ঘটে গেল। ছাদের পাইপ বেয়ে ঝপাৎ করে নেমে পড়েছে সেই ছাঁটা গোঁফ এবং ছুটে গিয়ে টেম্পোয় উঠেছে—ভট্‌ভট্‌ করে টেম্পোটাও ছেড়ে দিয়েছে। তৎপশ্চাতে আমাদের পরিচিত কনষ্টেবলজি গলি পথ দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে 'হাঁ' হয়ে থাকে। অস্ফুট কণ্ঠে শুধু বলে, শালা, বড়ি জোর গুণ্ডা বা—

আমার ঘরের দরজা খুলে দাও পাহারওলাজী, ককিয়ে ওঠেন ভদ্রমহিলা।

তারপর আমার বীর্যবত্তার পালা। পাহারওলার কাঁধে চড়ে পাইপ বেয়ে ছাদে ওঠা এবং বাড়িতে ঢুকে বাইরের দরজা খোলা। সে এক অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক কাহিনী!

যাই হোক বাড়িতে ঢুকে ভদ্রমহিলা এঘর ওঘর ঢুঁড়তে থাকেন।

নাঃ, আলমারী ঠিকই আছে, বাক্স প্যাঁটরাও ঠিক আছে। কাপড় চোপড় কড়া খুন্তি সবই ঠিক আছে। কেবল টানাটায় একটা ফল্‌স চাবির গোছা ঝুলছে।

মা আপত্তারিনীর দয়া। কিছু নিতে পারেনি, বলেই উনি বসে পড়েন। তারপর পাহারওলার দিকে চেয়ে বলেন, যাই হোক, তুমি ছিলে বলেই বাছা, ও পালাল, নয়ত আমার আসার আগেই সব ধুয়ে নিয়ে যেত।

হামি নয় মাজী, এই দাদাবাবু অউর দিদিমণি পয়লা ওকে ধরেছিল। তা'পর ত হামি এসেছি—হামি আভি যাতা হায়, উসকো পিছু ঢুঁড়তে হোবে। ঠিক পাকড় লিবো, মুখ চিনা হয়ে গেছে, মোচ দেখলেই বুঝতে পারব—

ছাই যাবে, শিপু আমায় কানে কানে বলে, ও ভাবছে কি জান। এখন এক ঘটি ভাঙ খেয়ে মুখে খৈনী লাগাবে—

আমি ও কথা ধর্তব্যের মধ্যে না ধরে বলি, তা পাহারওলাজি, তুমি ঐ মোচ ধরে চিনবে কি করে? ঐ ছাঁটা গোঁফ ঝাঁটা হ'তে কতক্ষণ। আবার সেটা উড়িয়ে দিয়ে ভোজপুরী সাঁটতেই বা কতক্ষণ?

হাঁ-হাঁ উ সব হামরা জানে—বলেই গট্ গট্ করে ভুঁড়ি দুলিয়ে হাঁটা দিল পাহারওলা।

তা বাছা, তোমরা বোসো না ঐ গদি বেঞ্চিটায়, ভদ্রমহিলা এবার যেন ধাতস্থ হন। একটু সরবৎ খাবে? এই নাও একটু কালীবাড়ির প্রসাদ নাও। আহা তোমরা ছিলে বলেই না। তা না হ'লে কী সর্বনাশই যে হ'ত!

সরবৎ খেতে খেতে শিপুকে বলি, মন্দ কি? গ্রীণ ম্যাঙ্গোর বদলে লিমন ঘোল, কি বলিস?

রাস্তায় নেমে শিপু বললে, ঐ দেখ ভজুয়া যাচ্ছে বাজার সেরে। ও কি ভাবছে বলতে পার?

আমার দরকার নেই ভজুয়ার মনের ভেতর ঢোকবার।

ও ভাবছে তিন টাকা যাট পয়সার হিসেব। বাজারের টাকা থেকে ও যে একটা জুস্‌লা খেয়েছে সেই পয়সাটা মাছের দামের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে হিসাব করছে।

প্রবল কৌতূহল চাপল আমার মাথায়। ভজুয়াকে ডাকলুম। ভজুয়া শিপুদের বাড়ি চাকর।

অনেক বাজার করেছিস দেখছি ভজুয়া, শুধালাম তাকে। হ্যাঁ, কত খরচ হ'ল রে? নিশ্চয়ই অনেক টাকার বাজার।

ভজুয়া বললে, তিন টাকা ষাট পয়সা।
আবার অবাক হবার পালা আমার।

বাড়ির কাছে মোড় পেরিয়ে শিপুকে হঠাৎ তারিফ ক'রে চলে উঠি। আচ্ছা শিপু বল দিকি সত্যি ক'রে এ বিদ্যেটা তুই কোথায় আয়ত্ত করলি ?

কোন বিদ্যেটা ?

এই মন পড়া বিদ্যে।

আহা, বলব কেন ?

তুই না হয় গুরু হয়েই থাকলি। কিরো পড়েও আমি হিরো হতে পারলুম না, আর তুই—

তবে বলছি। হয়েছে কি জান? কাল রাত্রে আমার এক তান্ত্রিক জ্যাঠাকে স্বপ্নে দেখেছিলুম। তিনি আমায় ছুঁয়ে বললেন, তুই যাকে দেখবি তার মনের কথা বুঝতে পারবি—ঐ যাঃ, সর্বনাশ! কী করলুম!

কি হ'ল?

বলে ফেললুম যে! তিনি মানা করেছিলেন স্বপ্নের কথা কাউকে যদি বলি তাহলে এ ক্ষমতা চলে যাবে। যাঃ। কি হবে এখন? তোমার জন্যেই হ'ল বটুদা, কি সর্বনেশে লোক তুমি!

যা হয়েছে ভালর জন্যেই আমি সান্ত্বনা দিতে কার্পণ্য করি না। কি ভয়ে ভয়েই যে ছিলুম এতক্ষণ! এখন নিশ্চিন্তে যা খুশি চিন্তা করা যাবে।

বা

চুনীলাল রায়

ভারতবর্ষ সতী সাধ্বীর দেশ। আর সেই সতী সাধ্বীদেরই প্রধান একজনের কাহিনীই আজ এখানে তোমাদের বলব।

এই সতী সাধ্বী হলেন কস্তুরবা গান্ধী—'জাতির জনক' মহাত্মা গান্ধীর সহধর্মিনী।

তাঁর সম্বন্ধে আর. কে. মাথুর 'সতী কস্তুরবা' গ্রন্থে বলেছেন, 'Accross the pages of history, the names of six women stand out in the reflected glory of their saintly husbands—Maitreyi, wife of the Upanishadic sage Yajnavalkya ; Yasodhara, wife of Gautama the Buddha ; Xanthippe, wife of Socrates ; Jijai, wife of the Maratha poet-saint Tukaram ; Sophia, wife of Tolstoy ; and Sharada Devi, wife of Shri Ramkrishna Paramahamsa. To these must be added the name of Kasturba, wife of Mahatma Gandhi.....'

কস্তুরবা সত্যি সত্যিই জীবনের সবক্ষেত্রেই ছিলেন গান্ধীজীর একজন প্রধান অংশীদার—সহধর্মিনী। ভারতের পৌরাণিক কাহিনীর মহাসতীদের সংগে তুলনা করে কস্তুরবাকে তাই বিচার করা হয়েছিল যথার্থভাবেই। সেজন্য একজন বলেছেন, 'সীতা এবং সাবিত্রীর মতো তিনি একাগ্রচিত্তে নিজেই তাঁর সর্বস্ব স্বামীকে দিয়েছিলেন।' একজন খ্যাতনামা ভারতীয় দার্শনিক মনে করেন যে,

"কস্তুরবার নীরব দুঃখভোগ, ত্যাগ, বিনয় এবং বিশ্বাস অনসূয়া এবং অরুন্ধতীর কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর সর্বস্ব ত্যাগ করা অস্তিত্ব সমগ্র জাতিকেই এক মহান মর্যাদা দান করেছে।"

কস্তুরবা, গান্ধীজীর মত একই বছরে (১৮৬৯) এবং একই জায়গায় (পোরবন্দর) জন্মগ্রহণ করেছিলেন! তাঁর পিতা গোকুলদাস মাকানজী এবং গান্ধীজীর পিতা করমচাঁদ গান্ধী (ওরফে কাবা গান্ধী) ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

মাত্র সাত বছর বয়সে মোহনদাসের সঙ্গে তাঁর বাগদান হয়। আর তখনকার দিনের প্রথামত তাঁদের বিয়েও হয় মাত্র তেরো বছর বয়সে।

পরবর্তী জীবনে গান্ধীজী নিজেই তাঁর এই বাল্যবিবাহের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তবে একথা আজ স্বীকার করতেই হবে যে, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে আমরা যে 'জাতির জনক' মহাত্মা গান্ধীরূপে পেয়েছিলাম তার পিছনে কস্তুরবার ত্যাগ এবং অবদান বড় কম নয়।

গান্ধীজী ছোটবেলায় খুব সাহসী ছিলেন না। বরঞ্চ তিনি সর্বদাই সাপ, ভূত এবং চোরের ভয় করতেন। একা একা ঘর থেকে বেরোবার মত সাহসও তাঁর তখন ছিল না। কস্তুরবার সাহায্য ছাড়া তিনি কিছুই করতে পারতেন না।

কস্তুরবার মনে কিন্তু কোনও ডরভয় ছিল না। চোর-ডাকাত, সাপ বা ভূত এসবের ভয় তিনি একদমই করতেন না। বরঞ্চ তিনি স্বামীকে তাঁর অহেতুক ভয়ের জন্য বিশেষ উপহাস করতেন।

দুর্বল মোহনদাস কস্তুরবাকে যেন শক্তিরূপে লাভ করেছিলেন।

প্রকৃতিতে কস্তুরবা ছিলেন সরল এবং কোনও রকম পাপ কোনদিন তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

বড় বড় শহরের প্রাসাদপোম বাড়ীর মধ্যেও তিনি সেবাগ্রামের ছোট-নীচু ছাদওয়ালা ঘরের কথা চিন্তা করতেন।

কস্তুরবার বিশেষ কোন লেখাপড়া শেখা ছিল না ('She was illiterate'—গান্ধীজী)। চিঠি লিখতেও তাকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হ'ত। এমন কি তাকে বেশ কষ্ট করতে হ'ত সোজা সোজা গুজরাটী বইগুলি পড়তেও, কিন্তু গ্রাম্য চাতুর্য এবং জানবার আগ্রহ তাঁকে মহিমান্বিত করেছিল।

ভারতীয় নারীদের কৃষ্টি, আত্মোৎসর্গ, বিশ্বাস এবং নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে নেবার যে ঐতিহ্য তা' যেন কস্তুরবার মধ্যে নিদর্শন দিয়ে বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে।

গান্ধীজী একবার উপলব্ধি করেছিলেন যে, একটা বিশ্বাসমণ্ডিত জীবন যাপন করে একজন স্ত্রী নিজেকে তার স্বামীর গুণের যোগ্য করে তুলতে পারে। কিন্তু কস্তুরবার নিজেরই একটা সামর্থ এবং শক্তি ছিল।

গান্ধীজীর স্ত্রী হওয়া তাঁর পক্ষে খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। এজন্য জীবনে অনেক ত্যাগ

এবং দুঃখ তাঁকে হাসি মুখে বরণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়েছিল। গান্ধীজীও একবার বলেছিলেন তিনিও তাঁকে কষ্ট দেবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করেন নি। কিন্তু কস্তুরবা কখনও তাতে পরাঙ্মুখ হননি।

বিয়ের পর কয়েক বছর অবশ্য প্রায়ই তাঁদের মধ্যে সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি হ'ত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কস্তুরবা তাঁর অদম্য সহিষ্ণুতার জন্য স্বামীকে বাধ্য করতেন সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনতে।

কস্তুরবার সমস্ত জীবনটাই অগ্নিপরীক্ষার মত কঠোর পরীক্ষায় পূর্ণ। ১৮৯৭ সনে গান্ধীজার সঙ্গী হয়ে যখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন তখন তিনি দেখতে পান যে, সত্যর সংগে গান্ধীজীর যে পরীক্ষা চলেছে তাতে তিনি তাঁর একজন প্রধান সহযোগী হয়ে পড়েছেন আর ঐজন্য তাঁকে নানারকম লাঞ্ছনাও সহ্য করতে হচ্ছে।

কস্তুরবাকে অলঙ্কার, পোষাকের জাঁকজমক এবং উপহার সামগ্রীও ত্যাগ করতে হয়েছিল। তাঁকে তাঁর স্বামীর খেয়াল-খুশীমতো খাবার খেতে হ'ত এবং খাবারে কোন রকম লবণ বা ছিম জাতীয় জিনিষ দেওয়া চলত না। একবার তাঁর খুব খারাপ ধরণের অসুখের সময় যখন তিনি একবার একেবার মৃত্যুর কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন তখনও তাঁকে গান্ধীজীর জন্য 'জল-চিকিৎসা' এবং প্রাকৃতিক আরোগ্যর ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

এক সপ্তাহের উপবাস নিয়েও তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং সবরমতী আশ্রমে হরিজনদের জন্য যথাযোগ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। এ'ছাড়া সেই বাসস্থানের কাছে তাদের ঠিকভাবে খাপ খাইয়ে তোলার দায়িত্ব-ও তাঁরই ছিল। তিনি তাঁদের নববলে বলীয়ান করে তুলেছিলেন।

পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশাধিকার ছিল না। কস্তুরবা সেই মন্দির দর্শন করেছিলেন বলে গান্ধীজী তাঁকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেন। আবার কিছু না ভেবেই তিনি আশ্রমে একবার নিজের ব্যক্তিমত কাজের জন্য কিছু খরচা করে বলেন। তাঁর এই কাজের জন্য তাঁকে কঠোরভাবে শাসন করে শান্ধীজী 'Young India'তে লেখেন।

গান্ধীজীর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ জনজীবনের মধ্যেও কস্তুরবা সদাসর্বদা তাঁর পাশে পাশে থেকেছেন। বিচারের সময় বা বিচ্ছেদের সময়ও তিনি সাধারণ ভাবে শান্ত মনে এবং সাহসিকতার সংগে তার মোকাবিলা করেছেন।

১৯১৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে একদল নর-নারী নিয়ে আইন অমান্য করে তিনি ট্রান্সভালের সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন। ঐ সম্বন্ধে তিনি গান্ধীজীকে আগেই বলেছিলেন, 'তুমি যদি দুঃখকষ্টকে বরণ করে নিতে পার, আর আমার ছেলেরাও যদি সেই দুঃখ সংগ্রামে তোমার অনুগামী হতে পারে, তবে আমিই বা কেন পারব না? আমিও এই কষ্টের সংগ্রামে যোগ দিতে বাধ্য।' তিনি গ্রেপ্তার হন এবং তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডও ভোগ করেন। সত্যি কথা বলতে কি, তিনি যেন অন্তরের অন্তস্থল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার এই সত্যাগ্রহে যোগ দেবার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। সরোজিনী

নেইডু-র কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, 'brave, frail, hard worn hands which must have held alot the lamp of her Country's honour undimmed in one alien land···,

১৯১৪ সনের মাঝামাঝি যখন তাঁরা ইংলণ্ডে ছিলেন তখন তিনি পরিশ্রম করে কাপড় বোনা শিখেছিলেন এবং আহত সৈন্যদের উপযোগী পোষাকও তৈরী করে দিয়েছিলেন। আর গান্ধীজী এবং তাঁর সহকর্মীরা 'ফার্ষ্ট এড্' ট্রেনিং নিয়ে আহতদের সেবা করেন। সেবাব্রতী কস্তুরবার চরিত্র মহত্ত্বে ভাস্বর।

১৯১৭ সনের নভেম্বর মাসে তিনি গান্ধীজীর আহ্বানে 'চম্পারণ' এ সমাজ সেবিকার কাজে এগিয়ে আসেন এবং একদল শিক্ষকের সাথে থেকে কাজ শুরু করেন। তিনি গ্রামবাসীদের ছোট ছোট কুঁড়েঘরগুলিতে যান এবং তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজনীয়তা, ভাল ব্যবহার করা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেন।

কিন্তু জীবনে আরো অনেক কঠোরতার সম্মুখীন হবার অভিজ্ঞতা তাঁর তখনও বাকী ছিল। এই অভিজ্ঞতা প্রথম এল ১৯২২ সনে যখন গান্ধীজী এক গোলযোগের অজুহাতে ছয় বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'ন। এই কঠোর শাস্তি কস্তুরবার কাছে এক বিরাট আঘাত রূপেই নেমে আসল। কস্তুরবা বিচলিত হয়ে পড়লেন ভীষণ ভাবে কিন্তু তবুও যুদ্ধক্ষেত্রে ছিন্ন-ভিন্ন সৈন্যদের মতো বিধ্বস্ত জনতাকে তিনি নেতৃত্ব দিলেন। এক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিয়ে তিনি তাদের যেন নতুন মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন, আজ যাঁরা আমার ব্যথা অনুভব করতে পারছেন, যাঁদের আমার স্বামীর প্রতি আস্থা আছে, আমি নর-নারী নির্বিশেষে তাঁদের সকলকেই আহ্বান করছি একাগ্রচিত্তে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে এই কার্য্যকরী পরিকল্পনায় যোগ দিতে এবং একে সার্থক করে তুলতে।'

১৯২৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজী যখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদ্দেশ্যে ২১ দিনের জন্য অনশন আরম্ভ করলেন তখন কস্তুরবাকে আরো একবার বিরল সাহসিকতার সঙ্গে হৃদয়স্পর্শী ত্যাগের মধ্যে দিয়ে এই কঠোর অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হ'ল। গান্ধীজীর বিভিন্ন সময়ের জীবনপাত করা অনশন প্রকৃতপক্ষে ছিল কস্তুরবার এক বিরাট ধৈর্য্যের পরীক্ষা।

কস্তুরবা তাঁর সময়কার বড় বড় জাতীয় আন্দোলন গুলিতে যোগ দিয়েছিলেন—অসহযোগ আন্দোলন এবং আইন-অমান্য আন্দোলন। আর এসব আন্দোলন গুলিতে তাঁর ভূমিকা অন্য নর-নারীর থেকে ছিল একটু বেশী গুরুত্বপূর্ণ, তাঁর আগের ইতিহাস।

১৯৩০ সনের এপ্রিল মাসে তিনি আশ্রমবাসী কয়েকজন মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাকে নেতৃত্ব দেন এবং তাঁরা বিদেশী পণ্যের দোকানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ১৯৩২ সনের আন্দোলনের সময় তাঁকে প্রথমে একবার ছয় সপ্তাহের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মাসে। তারপর মার্চ মাসের ১৫ই তারিখ থেকে ছয় মাসের জন্য তাঁকে আরেকদফা কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। এবার তিনি

গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের সর্বপ্রথম কর্মক্ষেত্র গুজরাটের অন্তর্গত 'বর্দৌলী' তালুকে গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন। ১৯৩৩ সনে তাঁকে আবারও একবার গান্ধীজী এবং অন্যান্য আশ্রমবাসীদের সংগে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

কস্তুরবার এই রকম অকুতোভয়তার উদাহরণ হাজার হাজার ভারতীয় নারীকে অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত করে এবং তারাও তাদের স্বামীদের সাথে কাঁধে-কাঁধ লাগিয়ে স্বধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে লাঞ্ছনা এবং কারাযন্ত্রণা ভোগ করেন।

১৯৩৮ সনে 'রাজকোটের মেয়ে' এই নামে তাঁকে সংগ্রামে আহ্বান করা হয়, তিনি এই ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন নি। তিনি সত্যাগ্রহ সংগ্রামে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন। এবার তাঁকে এক পাণ্ডব বর্জিত গণ্ডগ্রামে নির্জনে কারাবাস করতে হয়।

বৃটিশ শাসকদের বিশ্বাস ভঙ্গের প্রতিবাদে যখন গান্ধীজী অনশন শুরু করেন তখন কস্তুরবা তাঁর সংগে পরামর্শ না করার জন্য গান্ধীজীকে মৃদু-তিরস্কার করেন। অবশ্য সাথে সাথেই তিনি গান্ধীজীকে তাঁর মুক্তির জন্য কোনও রকম আবেদন করতে নিষেধ করেছিলেন। যদিও এর ফলে তিনি কঠোর পরীক্ষার দিনে গান্ধীজীর পাশে পাশেই থাকতে পারতেন। তাঁর সরল কিন্তু অকপট বিশ্বাসে তিনি মনে করতেন, 'ঈশ্বর তাঁকে আগের অনেক বিচার থেকে মুক্ত করে এনেছেন। এবারও তিনি তাঁর সাথে সাথেই থাকবেন।'

চরমতম পরীক্ষা এল ১৯৪২ সনে। ৯ই আগষ্ট সকালে গান্ধীজী এবং অন্যান্য বড় বড় কংগ্রেস নেতারা 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের চরম মুহূর্তে বোম্বাইয়ে গ্রেপ্তার হলেন। সেই চরম সময়ে উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে কস্তুরবা ঠিক করলেন, সেদিন সন্ধ্যাবেলায় 'শিবাজী পার্কের' জনসভা তিনিই গান্ধীজীর অনুপস্থিতিতে পরিচালনা করবেন, নেতৃত্ব দেবেন দেশবাসীকে। কিন্তু তিনিও গ্রেপ্তার হলেন।

দেশব্যাপী এই নির্মম ব্যাপক গ্রেপ্তারে তাঁর শরীর একদম ভেঙ্গে পড়ল। তিনি অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন, এবার পূণার আগা খাঁ-প্রাসাদে গান্ধীজীর কাছে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। তাঁর ছোট ছেলে দেবদাস ঐ সম্বন্ধে বলেছেন, 'এই চরম অগ্নিপরীক্ষাতে তাঁর শরীর এবং মন দুই-ই একদম ভেঙ্গে পড়ে।'

এই ঘটনার মাত্র এক সপ্তাহ পরেই ১৫ই আগষ্ট পুত্রাধিক মহাদেব দেশাই সত্যের জন্য সংগ্রাম করে প্রাণ দিলেন কারাগারে। এই দুঃখজনক ঘটনা তাঁর দুঃখকে সহস্রগুণে বাড়িয়ে দিল।

১৯৪৩এর মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি পরপর বেশ কয়েকবার হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন।

১৯৪৪ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তাঁর শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটল। এর মাত্র দু'দিন পরেই ২২শে ফেব্রুয়ারী 'শিবরাত্রি'-র পুণ্যদিনে সন্ধ্যাবেলায় তিনি তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

১৯৪৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে জেলে গান্ধীজী তাঁর অনশনের ১২ দিনের দিন মৃত্যুর নাগপাশ ছিন্ন করে এসেছিলেন। আর সেদিন থেকে শুরু করে কস্তুরবার এক বছরের প্রার্থনা শেষ হবার দিনই কস্তুরবা দেহত্যাগ করেন। সতী-সাবিত্রীর ব্রতের সঙ্গেই এই ঘটনাকে তুলনা করা যায়।

কস্তুরবার মহাপ্রয়াণ সমস্ত জেলকেই এক পবিত্রতা দান করেছিল।

গান্ধীজী কস্তুরবার মূল্যায়ন করেছিলেন খুব সুন্দর ভাবে, 'Her greatness lay in complete self-effacement...her ability to lose herself in me. She was unique and in a class by herself...Ba gave me her heart first, her head followed gradually in its wake." কস্তুরবা গান্ধীজীর সঙ্গে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামগুলিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। "I learnt the lesson of non-violence from my wife. What I did in South Africa was an extension of the rule of satyagraha which she...practised in her own person." অন্য আর এক উপলক্ষে তিনি বলেছিলেন, "For thirty years she had filled the place of my mother." সত্যি কথা বলতে কি তিনি কেবলমাত্র আশ্রমবাসীদেরই তিনি 'বা' ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর কোটী কোটী দেশবাসীরও 'মা'। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন গান্ধীজীর জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, গান্ধীজীর জীবনবীণার একটি প্রধান তন্ত্রী।

অবশ্য কস্তুরবা তাঁর স্বাভাবিক বিনয় সহকারে বলেছিলেন, 'আমি সারা জীবনে বাপুর অনুসরণ করা ছাড়া আর কিছুই করি নি। আমি আশ্রমের নিয়মগুলি কেবল পালন করেছি। বাপুর সংগে কাজ করেছি এমন মুহূর্ত আমার জীবনে বিরল।' কিন্তু তিনি যে মহান উদাহরণ রেখে গিয়েছেন তাই দেশবাসীর হৃদয়ে অনেক, অনেকদিন আঁকা থাকবে। অনুপ্রাণিত করবে ভবিষ্যতের হাজার হাজার নর-নারীকে।

তাঁর মহাপ্রয়াণে শোক প্রকাশ করে সরোজিনী নাইডু যা' বলেছিলেন তাই বোধ হয় তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা, "Never once did her feet falter or her heart quail on the steep path of perpetual sacrifice which was her portion in the wake of the great man whom she loved and served and followed with such surpassing courage, faith and devotion. Let us rejoice that she has passed from mortality to immortality and taken her rightful place in the valiant assembly of the beloved heroines of India's legend, history and song."

এসো তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে এই মহান ভারতীয় নারীর প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি।

স্বদেশপ্রাণ

শ্রী মোহিত রায়

আড়াই হাজার বছর আগেকার ইতিহাসের পাতা মেলে ধরেছি।

রোমনগরী।

হঠাৎ এক অঘটন ঘটল। রাজসভায় দেখা দিল বিরাট ফাটল। অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই এই ফাটল ভরাট করা গেল না।

এই কুলক্ষণ, অমঙ্গল দেখে রোমবাসীরা ভয় পেল। জ্যোতিষীরা গণনায় বসলেন। তাঁরা বললেন, যে ভগবানের অভিশাপেই এই অঘটন ঘটেছে। ভগবানকে খুশী করতে হবে। সবচেয়ে দামী যে জিনিষ তাই ফেলতে হবে ফাটলের ভিতরে। তাহলেই ফাটল বুঁজে যাবে।

খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা রোমে। দলে দলে রোমবাসীরা যার কাছে যা দামী জিনিষ ছিল তা সব ফেলতে লাগল ফাটলের ভিতরে। দামী জিনিষ বলতে রোমবাসীরা বুঝেছিল—হীরে, মানিক, সোনা, জহরৎ, রূপো, এইসব।

তবু ফাটলের মুখ বুঁজল না।

সকলে ভাবতে লাগল—হীরে-মানিকের চেয়ে আর কী দামী জিনিষ আছে দেশে?

এমন সময় একদিন রাজসভায় এল রোমের এক কিশোর।

তার নাম কারটিয়াস। দেখতে খুব সুন্দর, ঠিক রাজপুত্তুরটি। বড় বড় টানা চোখ—যেন পটলচেরা। চওড়া কপাল। টিকলো নাক। ঘন কালো চুল। টকটকে ফরসা গায়ের রং। লোহার মতো মজবুত দেহের গড়ন। গায়ের জোরে জুড়ি মেলা ভার।

কারটিয়াস এল রাজসভায় সাদা ঘোড়ায় চড়ে টগ্‌বগিয়ে বীরের মতো—নিঃশঙ্ক সাহসীর মতো। লোহার বর্মে তার শরীর ঢাকা, কোমরে ঝুলছে তলোয়ার।

রাজসভার সকলে অবাক হয়ে গেল—এতটুকু ছেলেকে রাজসভায় আসতে দেখে! একজন বললেন—তুমি আবার কী দামী জিনিষ এনেছ? তোমার হাতে তো কিছুই দেখছি না! লুকিয়ে এনেছ নাকি? দেখাও তো—কী দামী জিনিষ এনেছ।

কারটিয়াস বলল—আমার জিনিষ দেখাবার নয়।

সকলে হেসে ওঠে জিনিষ আবার দেখাবার হয় না—এমন জিনিষ হয় নাকি?

হয়। কারটিয়াস যে দামী জিনিষ এনেছিল—দুনিয়ার কম লোকই তা দেখাতে পারে। রাজ-

সভার সকলে উদগ্রীব হয়ে চেয়ে রইল কারটিয়াসের দিকে—কখন সে তার দামী জিনিষ ফেলবে ফাটলের ভিতরে।

কারটিয়াস ঘোড়া থেকে নেমে নির্ভয়ে এগিয়ে গেল ফাটলের কাছে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল জন্মভূমিকে। তারপর ঘোড়ায় চড়ে ফাটলের মুখের কাছে এসে কম্পুকণ্ঠে বলল—নিজের জীবনের চেয়ে দামী জিনিষ আর কিছুই নেই। আমার পবিত্র জন্মভূমির জন্যে আমি আমার নিজের জীবন দান করছি!

আর মুহূর্ত দেরি করল না কারটিয়াস। ঘোড়া নিয়ে লাফিয়ে পড়ল ফাটলের ভিতরে। নিমেষেই মিলিয়ে গেল ফাটলের অতল গহ্বরে।

কী আশ্চর্য। ধীরে ধীরে ফাটলের মুখ বুঁজে গেল। সকলে উল্লাস করে উঠল। মঙ্গলধ্বনি বাজল রাজসভায়। কারটিয়াসের জীবন দানে দেশ হল বিপদ মুক্ত। রোমবাসী বিস্মিত হল মুগ্ধ হল কিশোর স্বদেশপ্রাণ কারটিয়াসের অতুলনীয় দেশপ্রেমে।

খুকুর খেলার রাজ্যে

বিশ্বপ্রিয়

খুকুর খেলার রাজ্যে পাবে—হরেক রকম খাবার,
নেই সেখানে ভাবনা কোনই মাপা র‍্যাশন পাবার।
বালির চিনি, কাদার পায়েস, এঁটেল মাটির মণ্ডা—
খাও না যে যার খুশী মতন, যে চাও যতেক গণ্ডা।
আরেক মজার খবর বলি, কিনতে ওসব হলে—
একটা দুটো খোলাম কুঁচির পয়সা দিলেই চলে।
নেই ওখানে নিষেধ মানার আইন প্যাঁচের ঝক্কি
চোরা বাজার নেইকো যেমন, তেমনই নেই রক্ষী।
কিন্তু সেথায় কিনলে খাবার মুখ বরাবর তুলে—
খাওয়ারই ভান করতে হবে, সত্যি খাওয়া ভুলে।

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

চাঁদের কথা (২)

বিস্মৃত অতীত থেকে মানুষ চাঁদের দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছে আর ভেবেছে, চাঁদের সৃষ্টি কেমন করে হল, কি দিয়েই বা চাঁদ তৈরি। চাঁদের বুকে এই যে সব পাহাড়, গহ্বর—এগুলোই বা কি? চাঁদকে নিয়ে কত গবেষণা, কত মিষ্টি-মধুর কল্পনা। কিন্তু এ সবের এখন অবসান হতে চলেছে। এ যুগের বিজ্ঞানীরা আর শুধু দূরবীক্ষণের সাহায্যে চাঁদকে দেখেই সন্তুষ্ট নন। তাঁরা একেবারে সরেজমিনে পরীক্ষা করে চাঁদের স্বরূপ নির্ণয় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই চাঁদে যাওয়ার এত তোড়জোড়।

চাঁদে মানুষ পাঠানো হবে। এখন তার জন্য জোর প্রস্তুতি চলছে আমেরিকায়, রাশিয়ায়। কত মহাকাশযান ও কৃত্রিম উপগ্রহ চাঁদকে লক্ষ্য করে মহাকাশে পাঠানো হয়েছে। গত চার বছরে আমেরিকা এরকম প্রায় ১৫টি চন্দ্রযান মহাকাশে পাঠিয়েছে। এদের কতকগুলি চাঁদের কক্ষপথে ঘুরছে, কতকগুলি চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণও করেছে। এই তো সেদিন—সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে রুশ মহাকাশযান জোণ্ড-৫ চাঁদের আকাশে পুরো একদিন ঘুরপাক খেয়ে, অতি কাছ থেকে চাঁদকে ভাল করে পরীক্ষা করে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন।

এইসব মহাকাশযান নানা সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিতে ভরা থাকে। এইসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে এ পর্যন্ত এরা চাঁদের এক লক্ষেরও বেশি ছবি তুলে আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। এ সব ছবির কোন-কোনটা চাঁদের এত কাছ থেকে তোলা যে কল্পনাই করা যায় না। এছাড়া নানা কোণ থেকে তোলা চাঁদের অজস্র ছবিও আছে। চাঁদের অপর পিঠের ছবিও বাদ যায় নি। এমন কি চাঁদের কাছ থেকে তোলা পৃথিবীর ছবিও আমরা পেয়েছি।

এইসব আলোকচিত্র থেকে চাঁদের ব্যাপক পরিচয় পেতে বিজ্ঞানীদের অনেক সুবিধা হবে। এ ছাড়া এইসব চন্দ্রযানে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রয়েছে সেগুলির সাহায্যে চাঁদের মাটির নমুনা বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করা হয়েছে, চাঁদের বুকে পাওয়া কত কিছুর রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়েছে।

এই সব পরীক্ষার ফলে চাঁদের বুকে মানুষ নামানোর উপযোগী শক্ত জায়গা যেমন খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে, তেমনি চাঁদ সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য এখনই জানা সম্ভব হচ্ছে।

চন্দ্রযানগুলির পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক গবেষণায় যে প্রাধান জ্ঞানটি আমরা লাভ করেছি তা হল এই যে, আমাদের পৃথিবী যে সব উপাদানে তৈরি চাঁদও সেই একই উপাদানে তৈরি। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, চন্দ্রপৃষ্ঠের অন্ততঃ কিছুটা অংশের উপাদানের সঙ্গে পৃথিবী-পৃষ্ঠের ব্যাপক অংশের উপাদানের আশ্চর্য মিল রয়েছে। এই তত্ত্বটি এবং আরও অন্যান্য কতকগুলি প্রমাণ মিলিয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, চাঁদ আর পৃথিবী যে একদিন একটিমাত্রই পদার্থ ছিল সেই তত্ত্বই ক্রমে বেশি করে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছে। তারপর যে কারণেই হোক চাঁদ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক দেহ ধারণ করে। এমন কি এখনও নাকি চাঁদ ক্রমেই পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সরে যাওয়ার গতিবেগও নেহাত কম নয়। প্রতি বছর প্রায় পৌনে ২ ইঞ্চি করে দূরে সরে যাচ্ছে চাঁদ।

যে সকল বিজ্ঞানী এই মতে বিশ্বাসী তাঁদের ধারণা চাঁদ পৃথিবীর কাছ থেকে এইভাবে সরে যেতে থাকলে তার আলোর জোর নিশ্চয়ই কমতে থাকবে। একদিন হয়ত চাঁদ এমনিভাবে একেবারেই অদৃশ্য হয়ে যাবে।

এদিকে আবার জেমস জীন্‌সএর মত প্রখ্যাত বিজ্ঞানী একদিন এই তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন যে সূর্য নাকি ক্রমেই ক্ষীয়মান হচ্ছে। স্বভাবতঃই সূর্যের আলোও কমে যাচ্ছে। কাজেই সূর্যের আলো এইভাবে কমতে কমতে একদিন হয়ত এমন অবস্থা দাঁড়াবে যে সূর্যের কিরণে পৃথিবী আর যথেষ্ট আলোকিত হবে না। এদিকে আবার চাঁদের আলোও থাকবে না। তাহলে দাঁড়ালো কি? পৃথিবী কি তাহলে এক ভয়াবহ নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাবে? কল্পনা করতে পারো আমাদের এই অবস্থা? ভাবলে সত্যিই শরীর হিম হয়ে যায়, তাই না? তবে তোমাদের আতঙ্কের কোন কারণ নাই। কারণ, বিজ্ঞানীরাই আশ্বাস দিয়েছেন যে, ৫০০ কোটি বছরের আগে সূর্যের তাপের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটবার কোন সম্ভাবনাই নাই।

অতএব আমরা নিশ্চিন্তমনে এখন চাঁদের অন্যান্য পরিচয়গুলো জেনে নিতে পারি। সে পরিচয় আমি আগামী মাসে তোমাদের দেব।

হজমী

বৈদ্যনাথ গুপ্ত

"কবরেজ মশাই কবরেজ মশাই
বুক ধড়ফড়্ করে,
ওষুধ দাও, পাঁচন দাও,
প্রাণ থাকে মা ধড়ে।"

"কী হয়েছে? কী খেয়েছ?
কিসের অনিয়ম?
দাও বিবরণ, ওষুধ দেব,
দূরে থাকবে যম!"
"কী আর খাব? কী আর খাব?
বলছি—মাথার কিরে,—
দশপো' দুধে ভিজিয়ে নিয়ে
পাকি দশপো' চিঁড়ে,
উড়কি ধানের মুড়কি ছ'সের
ছ'পণ কাঁঠাল-কোওয়া
ন'পণ কলা এবং ন'সের
দিঙ্‌নগরের মোওয়া—.
ফলার খেলাম। খাই নি কিছু
এটুক জিনিস বৈ,
খাইনি বেশী এ ছাড়া আর,
পেটুক তো আর নই!"

কবরেজ বলে—"ছিঃ,
এই খেয়ে তোর হয় না হজম,
ওষুধ খাবি কি?"

ছড়া

মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নবাব খাঞ্জা খাঁয়ের উজির
মাঞ্জাপ্রসাদ ঢ্যাং
নিত্য খেতেন তিনটে ক'রে
জলহস্তীর ঠ্যাং।

চিংড়িপোতার ধুনুচিনাথ
মনসাপোতায় গিয়ে
ধুনোর গন্ধে মা-মনসায়
তুললেন তাতিয়ে।

পোস্তা থেকে সস্তাদরে
কস্তাপেড়ে শাড়ি
বস্তা ভ'রে কিনে নিয়ে
সতীশ এল বাড়ি।

গোবরডাঙ্গার গঙ্গাচরণ
পটলডাঙ্গায় এসে
বাঘের দুধের খোঁজ না পেয়ে
পটল তুলল শেষে।

তিক্রম সিং দারোয়ানের
বিক্রম জোরদার—
ডাকলে প্যাঁচা কাছা খুলে
দৌড়ে পগারপার।

চণ্ডীখুড়োর তুলনা নেই—
এতই সে কঞ্জুষ,
দেয় না কভু নাতিরে কিনে
একটি লজেঞ্চুস।

সেবার পুজোর বন্ধে গিয়ে
দেখলাম অণ্ডালে—
পৈতে গলায় দুর্গাপুজো
করতেছে চণ্ডালে!

"বন্যাকবলিত ভগবানপুরে"

শ্রীভবেশচন্দ্র চাউল্যা (গ্রাঃ নং ১১৮৭৮)

ঘুরে এলুম ভগবানপুর—

শুনে এলুম কতো সহস্র গৃহহীন, বস্ত্রহীন, অনশনক্লিষ্ট, অসহায় মানুষেব বুক-ফাটা আর্তনাদ।

শিশুসাথীর ভাইবোনেরা, আজ তোমাদের সামনে তুলে ধরছি—বন্যা-বিধ্বস্ত ভগবান-পুরের বিশেষ একটি দরিদ্র কৃষকপরিবারের সকরুণ মর্মান্তিক প্রতিচ্ছবি। বিগত দিনের করুণ দুঃখচ্ছবিগুলি ম্লান হয়ে যায়—শুধু এই পরিবারটির করুণ ভয়াবহ চিত্রটি যখন মনস্পটে ভেসে ওঠে। এক অব্যক্ত বেদনায় মন ব্যথী হ'য়ে ওঠে তাদের জন্য।

১৩৭৫ সালের শ্রাবণে ভেসে গেছে ভগবানপুর—ভেসে গেছে তার ঐতিহ্য বন্যার সীমাহীন অতলজলে। এখন সেখানে সৃষ্টি হয়েছে কীর্তিনাশা-প্রলয়ঙ্করী মহাসমুদ্রের। জানি না, ব'য়ে আসা এই সমুদ্র ভবিষ্যতে প্রশান্ত হয়ে উঠবে কিনা? আজ ভগবানপুরের শ্রী কোথায়?

সেবার আমাদের কয়েকজন বন্ধুতে মিলে বন্যাপ্লাবিত ভগবানপুর দেখতে গেলুম। আমাদের বাড়ী থেকে বেশ খানিকটা দূরে ভগবানপুর। চারখানা বাস বদল করতে হয় সকাল বেলায় বেরিয়ে পড়লুম আট বন্ধুতে মিলে। সঙ্গে কিছু খাদ্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদি নিলুম

গাড়ী ছুটে চলছে তীব্র বেগে। আমাদের মনও ছুটছে আরও তীব্র গতিতে। চতুর্থ বাসে যখন উঠলুম তখন বেলা প্রায় এগারোটা। গাড়ী ছুটে চলছে। লাইনের দুই দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়—শুধু দেখা যেতে লাগল সীমাহীন জলের ঢেউ। মিলিয়ে যায় দিগ্‌চক্রবাল। মাঝে মাঝে দূরে—বহুদূরে ফুটে ওঠে সবুজ প্রান্তের এক ক্ষীণ সীমারেখা। গাড়ীতে বসে শুধু কল্পনায় আঁকতে লাগলুম ভগবানপুরের চিত্র।

লাইনের উপর জল। গাড়ী আর গন্তব্যস্থলে এগুতে পারল না। বাধ্য হয়ে নেমে পড়লাম আমরা।

লাইনের উপর আশ্রয় নিয়েছে সর্বহারা অসহায় সব আর্তরা। বিষাদের ঘনছায়া ঘনায়িত তাদের চোখেমুখে। আজ তারা নিঃস্ব, অসহায়, পথের ভিখেরী।

নৌকো নিয়ে বেয়ে চললুম সমুদ্রের উপর দিয়ে ভেবো না,—এ আসল সমুদ্র···কয়েক-দিনের বৃষ্টিতে সৃষ্টি হয়েছে এই তাণ্ডব-প্রলয়ঙ্করী সমুদ্র। কত মৃত গৃহপালিত পশু চোখে পড়ল। দু'টি মৃত মানুষ ঢেউয়ের সঙ্গে এলোমেলো ভাবে ভেসে চলছে। একসময় যেসব স্থানে ছিল মানুষের বসতি, আজ সেখানে একটিও গৃহের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। সব তলিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দু'-একটি দ্বীপের মত অবস্থান করছে। এইরূপ একটি দ্বীপের প্রতি লক্ষ্য করে বেয়ে চললুম নৌকা নিয়ে। লক্ষ্য শুধু অজানা সেই দ্বীপ আবিষ্কার নয়, উদ্ধারকল্পেও। যতই নিকটবর্তী হতে লাগলাম, স্পষ্ট হয়ে উঠল গৃহের চারিদিকটা।

না—এখনও বন্যার করাল গ্রাসের কবলিত হয় নি ঐ গৃহটি। আছড়ে পড়ছে জল তার দেওয়ালে। ঘন ঘন আঘাতের ভার আর সইতে পারছে না···। ক্রমে ক্রমে গৃহাভ্যন্তর হ'তে শোনা যেতে লাগল—অস্পষ্ট কান্নার একটা একটানা রোল। গৃহের কাছে আসতেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠল ক্ষুধাজীর্ণ কয়েকটি প্রাণীর বুকফাটা আর্তনাদ। নৌকা থেকে নেমে গৃহের দিকে এক পা, এক পা করে এগুতে লাগলাম।

এ বাড়ী একটি দরিদ্র কৃষকের। স্ত্রী, পুত্র ও একটি কন্যা নিয়ে এদের এই ছোট

সংসার। কোন উপায়ান্তর না দেখে ভগবানের উপর ভরসা রেখেই তারা ঘরের মধ্যে ছিল। এদিকে বন্যার জল, তার গৃহের চারিদিক ঘিরে ফেলেছে। অসহায় ভাবে তারা ঘরের মধ্যেই পড়ে আছে। কেউ নেই যে ওদের সাহায্য করতে আসবে। আজ তিনদিন হ'লো সঞ্চিত সব খাদ্য ফুরিয়ে গেছে। কি করবে ওরা—আর দুধের শিশুটি ? জামি না, ভাগ্যের কোন ক্রুর পরিহাসে আজ ওরা চারিটি প্রাণী নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত। সত্যি, আজ ভাবতে আশ্চর্য হয়ে যাই—যদি আমরা ঐ সময় না পৌঁছুতাম, তাহলে কি হ'তো ওদের ! ক্ষিধের জ্বালায় অকালে তিল তিল ক'রে শুকিয়ে মারা যেতো এই নির্জন দ্বীপে। কেউ জানতে পারতো না। আশ্চর্য লীলাখেলা এই ধরিত্রীর ! ত্রাণকার্যে এতো সেবক নিযুক্ত হয়েছে কিন্তু কারুর কি লক্ষ্য পড়ল না এই দ্বীপটির প্রতি ! যাই হোক, তাদের কিছু খাইয়ে আমরা তাদের নৌকায় করে "বন্যার্ত ত্রাণ সংসদে পৌঁছে দিয়ে আবার আমরা নৌকা নিয়ে ঘুরতে লাগলুম। সেদিনের সেই চারিটি অসহায় প্রাণী কৃতজ্ঞতার অশ্রু বিসর্জন ক'রে ভগবানের উদ্দেশ্যে হাত তুলে কি প্রার্থনা করলো কে জানে ? তাদের সেই অসহায় পাণ্ডুর জীর্ণ মুখচ্ছবিগুলি আজও স্পষ্ট হয়ে আছে আমার স্মৃতিপটে।

এরপর কত কি বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়ল—কতো বস্ত্রহীন অসহায় নর-নারী, আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিত হয়ে তাদের লজ্জা নিবারণ করছে। আমাদের দেওয়া বস্ত্রগুলি পরিধান করে তারা ডাঙ্গায় এসে কৃতজ্ঞতা জানায়।

কিন্তু হায় ! অল্প বস্ত্রে কতজনের আর উপকার করতে পারি ? আরো যে কত শত নর-নারী বস্ত্রহীন, তার আর ইয়ত্তা নেই।

ফিরে এলুম ভগবানপুর হতে বিষণ্ণ মনে। আজও মন ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে তাদের জন্য সমব্যথী হয়ে।

পুতুল কথা বল

অমরেন্দ্রনাথ রায় (গ্রাঃ নং—১১৩০৫)

পুতুলমণি বল না শুনি,
রাগ করেছিস কেন ?
দু'দিন ধরে মুখ করেছিস
হাঁড়ির মতন যেন।
ভুল করে' ভাই গোমড়ামুখে
একটু দে না হেসে,
প্রথম প্রথম আড়ি ক'রে
করবি না ভাব শেষে ?

এমনি করে' রাগলে পরে
চিমটি দেব গায়,
আলতা ঢেলে দেবো না আর
টুকটুকে তোর পায়।
তবুও চুপ ? ভাঙলো না মান ?
নিঠুর পুতুল তুই,
বল কথা বল, দেবোরে হাতে
নতুন ফোটা জুঁই।

এইতো রে বেশ, মুখ তুলেছিস
বল কিছু ভাই বল ;
পরাব তবে রঙীন শাড়ী,
পায়ে রূপোর মল।

প্যারিসে দেখানো ম্যাজিক

যাদুরত্নাকর এ. সি. সরকার

প্যারিসের টেলিভিসনে আমার যাদু-প্রদর্শনী বিশেষ সাফল্য লাভ করায় রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলাম আমি। আমার কণ্ঠগীটার আর যাদু খেলার প্রসংসা করছিল তখন লোকের মুখে মুখে। হোটেল, রেঁস্তোরা, দোকান-পাট যেখানেই যেতাম, সেখানেই আমাকে সবাই ধরে বসতেন ম্যাজিক দেখানোর জন্য।

সেদিন সকালে কফি খাচ্ছিলাম প্যারিসের এতোয়াল অঞ্চলের একটা রেঁস্তোরাতে। এক ভদ্র মহিলা এগিয়ে এসে পরিচয় করলেন আমার সঙ্গে। পরিচয়ের পরেই অনুরোধ—একটা ম্যাজিক দেখাতে হবে।

পকেট থেকে আমার একটা ফটো বের করে তার সামনে ধরলাম। তিনি দেখলেন কৌতূহল ভরে। আমার অনুরোধে তাঁর ব্যাগ থেকে এক শিশি 'স্মেলিং সল্ট' বের করে তিনি ধরলেন ফটোটার সামনে। ফটোতে আমার গালে, নাকে, কপালে লালচে আভা ফুটে উঠলো। 'স্মেলিং সল্ট'-এর ক্রিয়া মানুষের উপরে হয় কিন্তু একটা ফটোর উপরে এই প্রভাব দেখে অবাক হলেন মেম সাহেব। ধরে নিলেন এ আমার যাদুরই প্রভাব!

মেম সাহেব এই কাণ্ডটাকে আমার যাদুমন্ত্রের প্রভাব বলে মনে করলেও আসলে কিন্তু এতে কোনও মন্ত্র-তন্ত্র বা যাদুর মারপ্যাচ ছিল না তেমন। আসলে আমি এই আজব কাণ্ডটি ঘটিয়েছিলাম এক রাসায়নিক মসলার দৌলতে। সোজা কথায় এই খেলাটাকে বৈজ্ঞানিক ম্যাজিক আখ্যা দিতে পারো তোমরা।

এমন কতকগুলো রাসায়নিক মশলা আছে যেগুলো কোনও ক্ষার জাতীয় জিনিষের সংস্পর্শে এলে লাল হয়ে যায়। ফেনাপথেলিন হচ্ছে এমনি একটি মশলা। এ হচ্ছে এক রকমের সাদা গুঁড়ো। সাধারণ জলে গুললে জলের রঙের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু সেই জলে যদি একটুখানি ক্ষার জিনিষ মিশিয়ে দাও তবে সঙ্গে সঙ্গে জল হয়ে যাবে টুকটুকে লাল।

অল্প একটু জলে খানিকটা ফেনাপথেলিন গুলে নিয়ে একটা সাদা কালো ফটোর উপরে গাল, নাক, কপাল ইত্যাদির উপরে এই জলে গোলা ফেনাপথেলিন অল্প অল্প করে লাগিয়ে নাও। ভাল করে শুকিয়ে গেলে এই ফেনাপথেলিন মাখানোর কাণ্ডটা বোঝাই যাবে না।

এখন এক শিশি স্মেলিং সল্ট দিয়ে এই মশলা মাখানো ফটোর সামনে ধরে দেখ আপনা থেকেই ম্যাজিকটা হয়ে যাবে। স্মেলিংসল্ট থেকে যে ঝাঁঝালো গ্যাসটা বেরয় তা হচ্ছে ক্ষার। ফেনাপথেলিনের উপরে এই ক্ষার-গ্যাসের প্রভাব পড়তেই ফেনাপথেলিন লাল রঙ নেবে আর তোমাদের দর্শকেরা অবাক হবেন।

এখন কথা হচ্ছে ফেনাপথেলিন পাবে কোথায়? যে কোন এলোপ্যাথিক ডাক্তারখানাতেই এ মশলা পাবে। এ হচ্ছে জোলাপের ওষুধ। কাজেই, এ যেন কোন মতে মুখে না যায়। সাবধান।

• শতদল ভট্টাচার্য •

শীতের দিনে বৃষ্টি পড়ে
কাঁপন লাগে — ছি!
ষণ্ডা জোয়ান হেসেই সারা
বললে — হল কি?
শীত কালে তোর শীতটি করে
পটকা রোগা — ছি!

ওস্তাদের ওস্তাদি

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

দুই ভাই,—রশীদ আর রহিম। সুবুদ্ধি যত থাক না থাক, দুর্বুদ্ধিতে দুজনেরই মগজ ঠাসা।

তারা শুনল আল্লাতলির কুদ্দুস ছোঁড়াটার বাপ মরেছে মাত্র এই সেদিন। মরবার আগে সে এক প্যাঁটরা ভরতি টাকা দিয়ে গেছে ছেলেকে।

তার এখন বাপও নেই, মাও নেই। আপন জন বলতে তিন কুলে কেউ নেই। অনাথই সে এখন একরকম।

কথাটা শুনেই একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল তাদের মাথায়। ভাবলে, এই তো মওকা—যেমন করেই হোক, তার কাছ থেকে ভোগা দিতে হবে টাকাগুলো।

এই মতলব করে তারা দু'জনে পা বাড়াল আল্লাতলির পথে। তার আগে জেনে নিলে ঠিক কোন্‌খানে কবর হয়েছে কুদ্দুসের বাবার।

ওই পথের ধারেই পড়ে গোরস্থান। সেখান থেকে কুদ্দুসের বস্তি মাত্র রশিখানেক দূর।

সেই গোরস্থানের কাছে গিয়ে প্রথমে চারদিকটা তারা একবার দেখে নিলে। যখন দেখলে ত্রিসীমানায় কেউ কোথাও নেই, তখন নিশ্চিন্দি হয়ে কুদ্দুসের বাবার কবরের পাশের খানিকটা জায়গা তারা দু'জনে মিলে খুঁড়ে ফেললে। তারপর তার মধ্যে ঢুকে রশীদ লুকিয়ে রইল আর রহিম তার ওপরের মাটি এমন নিখুঁতভাবে চৌরস করে দিলে যে কার সাধ্যি বলে যে সেখানকার মাটি একটু আগে খোঁড়া হয়েছিল।

তারপর কুদ্দুসের বাড়ি গিয়ে ডাকাডাকি করতেই সে বেচারা হন্তদন্ত হয়ে বাড়ীর বাইরে এসে অবাক হয়ে দেখে এক অজানা অচেনা লোক তারই খোঁজ করছে।

সে তার মুখের দিকে বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে দেখে রহিম বললে,—কিরে কুদ্দুস, তুই যে রকম হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছিস যেন তোর দাদাকে তুই চিনতেই পারছিস না।

কুদ্দুস কাঁচুমাচু হয়ে বললে,—চিনব আর কোত্থেকে বল,—আগে তো কখনো দেখি নি আর বলতে কি শুনিনিও কখনো যে আমার আবার কেউ দাদা আছে।

—যাকগে সে কাথা যাক, যে কারণে আমার আসা তাই বলি। জানিস তো বাবার এক

প্যাঁটরা টাকা ছিল। অনেক দিন আগে বাবা একদিন আমাকে বললে,—দেখ রহিম, এই যে প্যাঁটরা ভরতি টাকা দেখছিস, আমি কবরে গেলে এ টাকা তোরই হবে—তোকেই আমি টাকাগুলো সব দিয়ে যাব।

কুদ্দুস প্রতিবাদের সুরে বললে,—না না, আমার যে কোন দাদা আছে, কিংবা তাকে টাকাগুলো দিতে হবে, একথা বাবা ঘুণাক্ষরেও কখনো জানায় নি আমাকে আর বিন্দুমাত্রও আমি বিশ্বাস করি না ও কথা।

রহিম বললে—বেশ, আমার কথা বিশ্বাস না হয় তো চল আমার সঙ্গে বাবার কবরের কাছে, আমি বলছি আমি ভজিয়ে দেব। তা হলে তো হবে ?

রহিমের কথাবার্তা আর তার রকমসকম মোটেই ভাল লাগল না কুদ্দুসের। তবু সে দোনামনা করে তার সঙ্গে চলল গোরস্থানে।

সেখানে গিয়ে রহিম বললে,—তুই নিজেই জিগ্যেস কর না বাবাকে।

কুদ্দুস তার বাবার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করল—বাবা, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে তোমার কাছে এসেছি একটা প্রশ্ন নিয়ে। আমার জানা দরকার আমার ওপরে কি কোন ভাই আছে ?

প্রশ্নের জবাব এলো,—হ্যাঁ বাবা, তুমি যার সঙ্গে এসেছ সে মিথ্যা বলে নি। সেই তোমার বড় ভাই! আমি বেঁচে থাকতে তাকে কথা দিয়েছিলাম আমার প্যাঁটরা ভরতি টাকাগুলো সেই পাবে। টাকাগুলো তুমি তাকেই দিয়ে দিও, না হলে আমার সত্যভঙ্গের পাতক হবে।

জবাব শুনে কুদ্দুসের মাথা তো গেল ঘুরে।

বেচারা নিতান্ত সরল ভাল মানুষ আর বাবাকে সত্যি ভালও বাসত খুব। তাঁর কথার তো নড়চড় করতে পারে না। কাজেই কি আর করে—রহিমকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ী গেল।

তাকে বাইরে বসিয়ে ঘরের ভেতর গিয়ে প্রথমে সেই টাকার দুঃখে হাপুস-চোখে খুব খানিকটা কেঁদে নিলে সে। তারপর প্যাঁটরা ভরতি টাকা নিয়ে গিয়ে তুলে দিলে রহিমের হাতে।

টাকার প্যাঁটরা হাতে নিয়েই রহিম তার বাড়ির দিকে দিলে চোঁচা দৌড়। মনে মনে ভাবলে কবরের পাশে থাক রশীদ বন্দী হয়ে, না হলে এখনই তো সে এসে টাকায় আবার ভাগ বসাবে।

ওদিকে মাটির নীচে অনেকক্ষণ হা-পিত্যেশ করে থাকার পরও রহিম এলো না দেখে রশীদের সন্দেহ হল নিশ্চয় কোন শয়তানী মতলব আছে তার। সে তখন অধৈর্য হয়ে অগত্যা নিজের চেষ্টাতেই কোন রকমে বেরিয়ে এলো মাটির নীচে থেকে। বাইরে এসেই সে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ীর পথে ছুটল রহিমের সন্ধানে।

অনেকটা পথ ছুটে যাওয়ার পর যখন সে রহিমের নাগাল ধরল, তখন দু'জনেরই দম প্রায় শেষ। ফোঁস-ফোঁস করে হাঁপাতে হাঁপাতে তারা দু'জনে পথের এক পাশে একটা ঝোপের ধারে গিয়ে নিরিবিলিতে বসল।

ঝিরঝিরে বাতাসে যখন তারা একটু চাঙ্গা হল, তখন শুরু হল টাকার ভাগ-বাঁটরা। একবার এ ভাগ করে তো ও বলে ঠিক হল না, আবার ও ভাগ করে তো এ বলে, আমার পাওনা আরও বেশী। একবার, দু'বার, তিনবার, কতবার কত রকম ভাগ যে হল কিন্তু দু'জনে একমত হয়ে কোন ভাগই মেনে নিতে পারল না তারা।

কথা কাটাকাটি হতে হতে ক্রমে মারমুখো হয়ে উঠল দু'জনেই—এই মারে তো এই মারে!

ঠিক সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল একখানা কাটারি হাতে তাদের সর্দার। তার কোদালের বাঁটের জন্য সে বনে গিয়েছিল কাঠের সন্ধানে। মনের মত কাঠ না পেয়ে সে খালি কাটারি হাতে ফিরছিল বন থেকে।

তাকে দেখে রশীদ আর রহিম দু'জনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে ডাকল—ওস্তাদ, ওস্তাদ, একবার এদিকে এস।

তাদের ডাক শুনে ওস্তাদ এলো। বেশ একটু অবাক হয়ে শুধোলো,—তোরা এখানে? কি ব্যাপার বল তো।

তখন তারা তাকে সব কথা আগাগোড়া খুলে বললে।

সব শুনে সে বললে,—তা আমাকে তোরা কি করতে বলিস?

তারা বললে,—এই ব্যাপারে তোমাকে সালিশ হতে হবে।

—তোদের মনের মত না হলে আমার সালিশী তোরা মানবি কেন?

—আল্লার কসম, তুমি যা ফয়সালা করবে, কোন ওজর আপত্তি না করে আমরা তা মেনে নেব।

ওস্তাদ বললে—বেশ, কিন্তু তার আগে রশীদ, তোকে একটা কাজ করতে হবে। আমার এই কাটারিটা নিয়ে ওই বন থেকে একটা বড় বাঁশ আর কতকগুলো বটগাছের ঝুরি আর বেশ শক্ত দেখে কতকগুলো লতাপাতা আনতে হবে! বেশী দেরী করিস না যেন, তা হলে আমি চলে যাব।

তার জরুরী তাগাদা শুনে রশীদ কাটারি হাতে ছুটে চলে গেল বনে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝুরি আর লতাপাতা দিয়ে কায়দা করে বেঁধে একটা বাঁশ নিয়ে এলো টানতে টানতে।

ওস্তাদ তার কাজের তারিফ করে বললে—সাবাস রশীদ, আচ্ছা, এবার আর একটা কাজ কর। বাঁশটাকে মাঝামাঝি কেটে দু'খানা কর।

রশীদের কাটারির গোটাকতক কোপেই দু'খানা হয়ে গেল বাঁশটা।

তখন ওস্তাদ বললে—বাঃ, বেশ হয়েছে। এখন বেশ তফাৎ তফাৎ করে মাটিতে দু'টো গর্ত কর আর সেই গর্তের মধ্যে খুব শক্ত করে পুঁতে দে বাঁশ দু'টোকে।

বাঁশ পোঁতা হলে ওস্তাদ নিজে পরীক্ষা করে দেখলে। দেখে খুশী হল, ঠিক যেমনটি সে চেয়েছে, তেমনি মোক্ষম করে পোঁতা হয়েছে বাঁশ দু'টো।

এবার সে একটু হেসে বললে,—তোরা নিশ্চয় অবাক হয়ে ভাবছিস ওস্তাদের এসব কি কাণ্ডকারখানা। তা হলে খুলেই বলি শোন।—আমি যখন টাকা গোনা-গাঁথা করব, তোরা দু'জনে গালমন্দ করবি, চাই কি হাতাহাতি করবি, সেটা আমি চাই না। তাই আমি তোদের দু'জনকে ওই দু'টো বাঁশের খুঁটির সঙ্গে তফাৎ তফাৎ করে বেঁধে দেব ওই লতাপাতা আর ঝুরি দিয়ে। টাকা ভাগ হয়ে গেলেই খুলে দেব, যে যার ভাগ নিয়ে সোজা চলে যাবি বাড়ী। কেমন রাজী তো?

তারা দু'জনেই বললে,—রাজী।

ওস্তাদ তখন এক এক করে তাদের দু'জনকে খুব কষে বাঁধলে সেই দু'টো বাঁশের খুঁটির সঙ্গে।

এমন করে বাঁধলে, যে তারা হাত-পা নাড়তে না পারে। তারপর দু'জনের পকেট থেকে দু'টো রুমাল বার করে নিয়ে তাদের মুখ দু'টোও দিলে বেঁধে, যাতে তারা কথাও না বলতে পারে।

বাঁধাছাঁদা শেষ হলে ওস্তাদ প্যাঁটরা খুলে টাকা-গুলো গুনেগেঁথে দু'ভাগ করলে। তারপর মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে—এ আবার এক ফ্যাসাদ হল। একটা টাকা বেশী হচ্ছে। এটাকে ভাঙ্গিয়ে না আনলে ঠিক মত ভাগ করি কেমন করে?

রশীদ, রহিমের মুখ বাঁধা। তারা গোঁ-গোঁ করে কি বললে তা তারাই জানে।

ওস্তাদ ততক্ষণে টাকাগুলো আবার প্যাঁটরাবন্দী করে উঠে দাঁড়িয়েছে। তাদের মুখে গোঁ-গোঁ শব্দ শুনে বললে—দাঁড়া, টাকাটা ভাঙিয়ে নিয়ে আসি। ঘাবড়াসনে, যাব আর আসব পলকের মধ্যে। তোরা তো এখন হাত-পা বাঁধা কাঠের পুতুল। টাকাগুলো রেখে যাই কার জিম্মায়, তাই সঙ্গেই নিলাম। বেশ ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে। তোরা ততক্ষণ একটু আরাম কর।

এই বলে প্যাঁটরাটা বগলদাবায় করে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে হাওয়া হয়ে গেল।

ওস্তাদ চলে যাওয়ার পর প্রায় দু-দণ্ড যখন কেটে গেল, অথচ সে ফিরল না, তখন দু' ভাই-এর বুঝতে আর বাকী রইল না যে, ধূর্ত ওস্তাদ তাদের আহাম্মক বানিয়ে চম্পট দিয়েছে টাকার প্যাঁটরা নিয়ে। তখন তারা প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেদের বাঁধন ছিঁড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সেই শয়তানের সন্ধানে।

ওদিকে ওস্তাদ করেছে কি— বাড়ী পৌঁছেই তার বউকে বললে —শোন, বেশী কথা বলার এখন সময় নেই। দু'জন লোক এখুনি আসবে আমার খোঁজ করতে। তাদের বলবে আমি মরে গেছি আর মড়া আছে পাশের ঘরে। বুদ্ধি করে বেশ গুছিয়ে গুছিয়ে বলবে। দেখব, তুমি কেমন চালাক মেয়ে।

এই কথা বলে সে পাশের ঘরে গিয়ে হাতে একটা ধারাল কাঁচি লুকিয়ে নিয়ে মিচকেমি করে মড়ার মত চুপচাপ শুয়ে রইল।

একটু পরেই রশীদ আর রহিম হন্তদন্ত হয়ে এসে শুরু করল হাঁকডাক—কই, ওস্তাদ কই?

তাদের হাঁকডাক শুনে ওস্তাদের বউ আড়াল থেকে ডুকরে কেঁদে উঠল—ওগো, আমার কি সর্ব্বনাশ হল গো—

কান্না শুনে ভ্যাবাচাকা খেয়ে তারা দু'জনে মুখ চাওয়া-চাওই করছে, এমন সময়ে সে চোখে কাপড় দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে বললে—তোমাদের ওস্তাদ কি আর আছে? এই তো একটু আগে সে ঘরে এলো বাইরে থেকে। এসে আমাকে বললে,—বড্ড বুক ধড়ফড় করছে, শীগগির একটা মাদুর পেতে দাও আর একটু ঠাণ্ডা জল দাও আমাকে। আমি তাড়াতাড়ি মাদুরে তাকে শুইয়ে দিয়ে, জল নিয়ে গিয়ে দেখি সব শেষ! ওঘরে সেই মাদুরেই সে কালঘুম ঘুমোচ্চে যে গো-ও-ও—

রশীদকে রেখে রহিম ওস্তাদকে দেখতে চলে গেল পাশের ঘরে।

হুমড়ি খেয়ে সে ওস্তাদের মুখের দিকে দেখছে। এমন সময় কোথাও কিছু না, ওস্তাদ কাঁচি দিয়ে আচমকা ঘ্যাঁচ করে দিলে তার নাকের ডগাটা কেটে।

রহিম প্রথমটা যন্ত্রণায় 'উহু' 'উহু' করে উঠল কিন্তু তখুনি আবার সামলে নিয়ে বোঁচা নাক লুকোবার জন্যে রুমাল চাপা দিয়ে রশীদের কাছে গিয়ে বললে—হ্যাঁ, মরেছেই বটে ওস্তাদ। দেখবি যদি তো দেখেই আয় একবার।

ওস্তাদ সত্যিই মরেছে শুনে রশীদ পাশের ঘরে গেল ওস্তাদকে শেষ দেখা দেখতে।

সে হুমড়ি খেয়ে ওস্তাদের মুখের দিকে দেখছে, এমন সময় ওস্তাদের কাঁচিতে আচমকা তার নাকের ডগাও—ঘ্যাঁচ্!

দুই ভাই নাকের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, হি-হি করে হাসতে হাসতে জলজ্যান্ত ওস্তাদ সশরীরে এসে হাজির।

দু'জনেই কটমট করে তার দিয়ে চেয়ে আছে দেখে ওস্তাদ বললে—আরে, চটছিস কেন? ঠাট্টা বুঝিস না?

রশীদ বললে—না, ঠাট্টা আমরা বুঝি না। আমাদের টাকাগুলো দিয়ে দাও, আমরা চলে যাই।

ওস্তাদ তাদের আশ্বাস দিলে—পাবি পাবি, টাকা তোদের মারা যাবে না। তবে আজ আর না, আসছে রবিবার সকালবেলা এসে টাকাগুলো নিয়ে যাস।

রবিবার একটু সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে ওস্তাদ করলে কি—পুকুর থেকে গোটাকতক শালুকের নাল তুলে আনলে। তারপর সেই ফাঁপা নালের মধ্যে লাল টকটকে খুন-খারাপি রঙ ভরে সেই নাল তার বউ-এর গলায় জড়িয়ে তার ওপর দিয়ে এমন করে তার শাড়ীটা ঘুরিয়ে আনলে যে কারো সাধ্যি নেই যে বোঝে, শাড়ীর নীচে সেখানে অন্য কিছু আছে।

একটু পরে দুই ভাই আসতেই ওস্তাদ খুব আদর অভ্যর্থনা করে তাদের বসালে আর বউকে বললে, তাদের জন্যে সরবৎ আনতে।

বউ সরবৎ দিয়ে চলে যাচ্ছিল, ওস্তাদ তাকে বললে—ওদের জন্যে দু'টো পিরিচে করে কাবাব নিয়ে এস।

বউ যেন কিন্তু-মিন্তু হয়ে বললে—কাবাব তো আজ ঘরে নেই।

বউ-এর মুখে সেই কথা শুনে ওস্তাদ যেন রেগে অগ্নিশর্মা।—কি বললি? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা—বলে, একটা কাটারি হাতে তেড়ে গিয়ে তার গলায় দিলে এক চোপ।

বউ-এর গলায় শালুকের যে নাল জড়ান ছিল, কাটারির ঘা লেগে তা থেকে ফিনকি দিয়ে রঙ বেরিয়ে লালে লাল হয়ে গেল বউ-এর শাড়ী আর মরে যাওয়ার ভান করে সে ধপ করে পড়ে গেল মেঝের ওপরে।

তখন ওস্তাদ করলে কি—একটা কৌটোর মধ্যে থেকে খানিকটা ছাই নিয়ে ছড়িয়ে দিলে বউ-এর গলার ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে বেঁচে উঠল বউ।

রশীদ আর রহিম তো অবাক এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে। টাকার কথা ভুলে তারা ওস্তাদকে তোয়াজ করতে শুরু করলে একটু ওই ছাই-এর জন্যে।

ওস্তাদ বললে,—আমার এলেমদারীতে খুশী হয়ে এক সিদ্ধ পীরসাহেব মেহেরবানি করে এই জীয়ন-মন্ত্র পড়া ছাই দিয়েছিলেন আমাকে। তা তোরা যখন ছাড়বি না কিছুতেই, নিয়ে যা এক এক মুঠো। কিন্তু সাবধান, বলিস না যেন আর কাউকে।

—না না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্দি থাক। বলতে বলতেই তারা মুঠো ভরতি ছাই নিয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে দে-দৌড়।

বাড়ী পৌঁছেই দুই ভাই খুব হম্বিতম্বি শুরু করল তাদের দুই বউকে ডেকে। তারপর ছাই-এর গুণ নিজের হাতে পরোখ করার জন্যে একটা ছল-ছুতো করে দিলে ঘ্যাচাং করে কাটারির চোপ বসিয়ে তাদের গলায়।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে রক্তের ঢেউ খেলে গেল সেখানে আর চোখ কপালে তুলে স্থির হয়ে গেল দুই বউ।

তারা কিন্তু একটুও না ঘাবড়ে গদাইলস্করি চালে কৌটো থেকে খানিকটা ছাই বার করে ছড়িয়ে দিতে লাগল তাদের গলার সেই কাটা জায়গায়। দিচ্ছে আর ভাবছে, এখুনি কি রগড়টাই না হবে, যখন দুই বউ হাসি মুখে দাঁড়িয়ে উঠবে ধড়মড় করে। কিন্তু দেখতে দেখতে ছাই ফুরিয়ে কৌটো শূন্য হয়ে গেল, তবু বউরা কেউ আর নড়লও না চড়লও না।

তখন রেগে টং হয়ে তারা আবার ছুটল ওস্তাদের বাড়ী।

ওস্তাদ তাদের দেখেই বললে—কিরে, তোদের দেখেই মনে হচ্ছে শিকারী বেড়ালের মত ফুলছিস যেন তোরা রাগে। বেশ বাবা, ঝগড়া মারামারিতে আর কাজ নেই। আমিও তিতিবিরক্ত হয়ে গেছি—ওসব আমার আর ভাল লাগে না। আমি ম'লেই যদি শান্তি হয় তো তাই হোক। তোরা একটা কাজ কর। একটা সিন্দুকের মধ্যে আমাকে বন্ধ করে একটা দড়ি দিয়ে বেশ করে বাঁধ। তারপর সেটাকে একটা পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে ফেলে দে। সব লেঠা চুকে যাক।

এই কথা বলে সে একটা খালি সিন্দুক আর খানিকটা দড়ি নিয়ে এলো আর সেই সিন্দুকের মধ্যে নিজে ঢুকে পড়ল। রশীদ আর রহিম সিন্দুকটা বন্ধ করে দড়ি দিয়ে বেশ করে বাঁধল। তারপর সেটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল একটা পাহাড়ের দিকে।

অনেকটা পথ গিয়ে পাহাড়তলীর একটা চৌরাস্তার কাছে পৌঁছে তারা শুনলে দূরের গাঁ থেকে

খুব ঢাকের আওয়াজ আসছে। ব্যাপারটা কি একবার দেখেই আসা যাক—এই ভেবে তারা সিন্দুকটা পথের এক ধারে সরিয়ে রেখে ছুটল যে গাঁ থেকে আওয়াজ আসছিল, সেই গাঁয়ের দিকে।

তারা তো চলে গেল। এদিকে পায়ের শব্দ শুনে ওস্তাদ বুঝলে পথ দিয়ে কেউ একজন যাচ্ছে। সিন্দুকের ভেতর থেকেই সে হাঁক দিলে—কে যায়?

পথিক থতমত খেয়ে বললে—আমি একজন সদাগর, মাল নিয়ে যাচ্ছি জাহাজ ঘাটায়।

সিন্দুকের মধ্যে থেকে জবাব এলো,—আমি ভেবেছিলাম কোন আমীর-ওমরা। তা নয়? তবে তুমি পথ দেখ।

সদাগর বললে—পথ আমি দেখছি। কিন্তু তুমি ও সিন্দুকের ভেতর বসে করছ কি?

—তোমার অত কথার জবাব দেওয়ার আমার ফুরসৎ নেই। আমি এখন সোনা-রুপো তৈরী করতে বেজায় ব্যস্ত।

—সিন্দুকের ভেতর সোনা-রুপো তৈরী! তা আমাকে একবার ভেতরে ঢুকে দেখতে দাও না।

ওস্তাদ জোর গলায় বললে—না না, তাহলে আমার কাজের দারুণ ক্ষতি হবে।

সে যত বলে 'না', সদাগর ততই কাকুতিমিনতি করে বলে—দোহাই তোমার, কেবল একবারটি ঢুকব আর দেখেই বেরিয়ে আসব—আর তোমাকে বিরক্ত করব না।

ওস্তাদ সত্যি যেন খুব বিরক্ত হয়েছে এমনি গলা করে বললে—আচ্ছা নাছোড়বান্দা লোক তো তুমি হে—ভেতরে না ঢুকে কিছুতেই ছাড়বে না দেখছি তুমি। তা হলে বাপু চটপট দড়ির বাঁধনগুলো খুলে ফেল আর আমি সেই অবসরে আমার যন্ত্রপাতি আর সোনা-রুপোগুলো একপাশে সরিয়ে রাখি—না হলে আমিই বা সিন্দুক থেকে কেমন করে বেরুবো আর তুমিই বা ঢুকবে কেমন করে? সারাক্ষণ সিন্দুকের মধ্যে কাজ—একবারটি বাইরে বেরিয়ে হাত-পা ছাড়িয়ে না নিলে কি হয়?

সদাগর হাত চালিয়ে দড়ির বাঁধনগুলো খুলে ফেলতেই ওস্তাদ সিন্দুক থেকে বেরিয়ে এলো আর সদাগর ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ঠিক এই সময় ওস্তাদ বলে উঠল—এইরে, একটা চৌকিদার যে আসছে এই দিকেই। আচ্ছা তা আসুক, এদিকে যা বলবার বা করবার সে আমি করছি, তুমি কিন্তু বাপু সিন্দুকের মধ্যে মুখে চাবি দিয়ে থাকবে, বাইরে যাই হোক টু-শব্দটি করবে না। করলেই প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

এই সব শুনে হতভম্ব হয়ে সদাগর সিন্দুকের মধ্যে বোবার মত চুপচাপ রইল আর ওস্তাদ দড়ি দিয়ে সিন্দুকটাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেললে।

তারপর সিন্দুকটা যেমন ছিল তেমনি রেখে সদাগরের মাল-পত্তরগুলো হাতে মাথায় নিয়ে ফিরে গেল বাড়িতে।

রশীদ আর রহিম খানিক পরে গাঁ থেকে ফিরে এসে দেখে পথের ধারে যেমন তেমনি পড়ে আছে বাঁধাছাঁদা সিন্দুকটা। তারা তখন সেটাকে টানতে টানতে পাহাড়ের ওপর নিয়ে গিয়ে দুম করে নীচে ফেলে দিলে।

ফেলে দিয়ে ভাবলে—যাক, ওস্তাদ এবার খতম হল।

তারপর তারা আর এক নিমেষও দাঁড়াল না সেখানে। টাকার প্যাঁটরাটা হাতাবার জন্যে পড়ি কি মরি করে ছুটল ওস্তাদের বাড়ির দিকে।

সেখানে গিয়ে ওস্তাদকে এক কাঁড়ি মাল-পত্তর গোছগাছ করতে দেখে, তাদের তো চক্ষুস্থির!

তাদের সেই ভাব দেখে ওস্তাদ হাসতে হাসতে বললে—ওগুলো যা দেখছিস, সব তোদেরই পয়ে পাওয়া। ভাগ্যিস তোরা আমাকে পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে ফেলে দিয়েছিলি, তাইতো ওগুলো পেলাম সেখানে।

সেই কথা শুনে দুই ভাই-এর সে কি ঝুলোঝুলি—তাদেরও সেই পাহাড়ের ওপর থেকে সেইখানে ফেলে দিতে হবে।

তাদের জেদাজেদি দেখে ওস্তাদ শেষকালে বললে—আচ্ছা, নেই-আঁকড়া তো তোরা। পাহাড়ের ওপর থেকে তোদের ফেলে না দিলে তোরা আমাকে কিছুতেই ছাড়বি না দেখছি। বেশ, তা হলে চল, সেই পাহাড়ে গিয়েই আবার উঠি।

পাহাড়ের ওপর যেখান থেকে সদাগরকে নীচে ফেলে দিয়েছিল, রশীদ আর রহিম ঠিক সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল আর ওস্তাদ এক ধাক্কায় তাদের দু'জনকে নীচে ফেলে দিয়ে বলে উঠল—যা নীচে থেকে নিগে যা ছালাভরা ধন-দৌলত।

তারপর সে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে টাকা ভরতি প্যাঁটরাটা নিয়ে সটান চলে গেল কুদ্দুসের বাড়ি। কুদ্দুসের হাতে প্যাঁটরাটা তুলে দিয়ে তাকে কেবল একটা কথা বললে—ভুলিস না, "খোদা মেহেরবান" (ভগবান দয়াময়)। তারপর খুশীমনে সুর করে কি একটা বয়েৎ আওড়াতে আওড়াতে ঘরে ফিরল আর রশীদ রহিমের টাকার তাগাদা থেকে রেহাই পেয়ে বউকে নিয়ে নিশ্চিন্দি মনে ঘরকন্না করতে লাগল।

দুর্গাদাস সরকার

অজানাকে জানাই মানুষের ধর্ম। আমাদের সভ্যতা ততোটুকু এগোচ্ছে, আমরা ক্রমাগত যতোটুকু এগোচ্ছি। এগিয়ে যাওয়ার অর্থই অজ্ঞাতপুরে প্রবেশ করে রহস্য ভেদ করা। যে রহস্য মানুষ ভেদ করতে পারে না—সে সম্বন্ধে তার জ্ঞান সীমিত। আবার আজ যেখানে জ্ঞান সীমিত বলে মনে হয়—কাল যে সেখানে মানুষের বুদ্ধিশক্তি বিকশিত হবে না—তাই বা কে বলতে পারে। কিন্তু জ্ঞান যতক্ষণ সীমিত থাকে—ততক্ষণ অজানা সম্পর্কে মানুষের মনে কৌতূহলের সঙ্গে কতো রকম ভয়, এমন কি, মিশ্র ধারণা পর্যন্ত জড়িয়ে থাকে! অজানাকে জানা সম্ভব হয় নি বলেই সৃষ্টি হয় অলৌকিক ধারণার। কী শিক্ষিত, কী অশিক্ষিত বা নিরক্ষর এ ব্যাপারে যেন কারো ভেদাভেদ নেই। আর যা কিছু ভেদ থাকে—তা অলৌকিকতার পরিমাণ নিয়ে। যেমন ধরা যাক, ভূত-প্রেত কিংবা দেব-দেবী। নানা সংস্কারের মধ্যে আজন্ম এরা আমাদের পরিবেশ প্রভাবে চেতনায় জড়িয়ে রয়েছে। এদের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে তেমন কৌতূহল নেই। কিন্তু রাত-বেরাতে গাঁয়ের মাথায় অশ্বত্থ গাছটাকে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে একলা পথচারী হঠাৎ একটা হস্‌হস্ শব্দ শুনেই ভয়ে আঁৎকে ওঠে। তারপর কম্পিত কলেবরে সে প্রায় মূর্ছাহত অবস্থায় দেখতে পায়, এগিয়ে আসা তালগাছের মতো লম্বা লম্বা দু'খানা পা। এরপর সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে তারা-খোচা অন্ধকারে অচেতন পথচারীর ভূমিতে পতন। ভূতকে মানুষ ভয় করে ঠিক, মানুষকেও কি ভূত কম ভয় করে? ভয় করে বলেই তো দিনমানে ভৌতিক কাণ্ড ঘটে না। কিছুটা সাহসী একাধিক লোক একস্থানে থাকলে সেখানে ভূতের দর্শন সহজে মেলে না।

এই ভূত-দর্শন করার জন্যে এখনো অনেকে হন্যে, কারো বা করে গা ছম্‌ছম। ভূতের দেখা যদি বা কারো দুর্ভাগ্যে মেলে, কোনো সৌভাগ্যেই ভূতনাথের দর্শন মেলে না। ভূতনাথ স্বল্পেই তুষ্ট। কিছু চাইলেই ত্রিশূল তুলে বলেন—তথাস্তু। ভূতনাথের সৃষ্টি কাহিনী লেখা আছে এবং তাঁর জন্ম আমাদের মনোভূমিতে। অধিকন্তু আমাদের মনোধর্মেই তিনি কখনো শিব, কখনো রুদ্র।

একটা কথার কথা আছে: মানুষ যতো বেশি শিক্ষিত হয়, ততো বেশি বিধর্মী হয়ে ওঠে। এই বিধর্মী হওয়া মানে—সাধারণ মানুষ অন্তর্নিহিত রহস্য না জেনে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, শিক্ষিত মানুষ রহস্য ভেদের পর অন্ধভাবে আর বিশ্বাস করে না। আমাদের দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের হার দেখলে বোঝা যাবে যে, এদেশে অন্ধ-বিশ্বাসীদের সংখ্যাই প্রায় শতকরা পচাত্তর ভাগ, অর্থাৎ জন-সংখ্যা যদি হয় পঞ্চাশ কোটি তাহলে অন্ধ-বিশ্বাসীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে সাইত্রিশ কোটি। ভাবতেও অবাক লাগে—একটা বিরাট জাতি গঠনের কথা যখন বলা হয়—তখনো পর্যন্ত কুসংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাস দূর করার কোনো চেষ্টাই হয় না। সাধারণ বিজ্ঞান সম্পর্কে কোনো ধারণা সাধারণ মানুষের মনে নেই বলে প্রয়োজন মতো অপপ্রচার চালানো সুবিধে হয়। এমন কি তথাকথিত শিক্ষিতদের মন জয় করা কতো রকম সংবাদ খবরের কাগজগুলিতে প্রকাশ করা হয়। অনেক সময় দেখা গেছে, কোনো একটা বড় সংবাদকে বাণচাল করে দেওয়া যখন দরকার, তখন হঠাৎ চারদিকে কালো বর্ডার দিয়ে সাজানো কিছুটা বড় অক্ষরে গজিয়ে ওঠে অলৌকিক খবর! যেমন মাতৃগর্ভ থেকে হস্তিমুণ্ড গণেশের জন্ম-কাহিনী, কিংবা কোনো শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই সাবালকের মতো কথা বলছে। মানুষ, মানুষ সম্পর্কে হয়তো সবচেয়ে বেশি কৌতূহলী। সুতরাং মানুষ যখন বাস্তব জগতে কোনো কিছুর অনুসন্ধানে রত বা বহু সংগ্রামের পর তার কাছাকাছি পৌঁছবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে—তখনই বিকৃত সংবাদে মানুষের চিন্তা বিপথগামী হয়। অথচ অলৌকিকতার বেড়া ভেঙে রহস্য ভেদ করার কথা খুব কম জনেই লেখে! নিশ্চয়ই, সেই সব বিজ্ঞানী—যাঁরা প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত—তাঁদের বক্তব্য বা মন্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা কতটুকুই বা হয়—যাদ্বারা সাধারণ লোক উপকৃত হবে?

বিদেশে অবস্থা অন্য রকম। এক-শ জনের মধ্যে এক-শ জনই যে দেশে শিক্ষিত, সেখানে চমকপ্রদ কথা লিখতে গেলে হিসেব করে লিখতে হয়। আমেরিকার মতো দেশটা নাকি পীত সাংবাদিকতার দেশ। অর্থাৎ সেখানে যদৃচ্ছা খবর ছাপা হয়। কিছু কিছু খবর—যা আমাদের কানে আসে তাকে রঙচঙে করে ছেড়ে দিলেই হয়তো অলৌকিকতার মর্যাদা পেতো, কিন্তু সে দেশে বিজ্ঞানী বা তথ্যানুসন্ধানীরা বসে নেই। এবং রহস্য ভেদ করতে তাদের দ্বিধাও নেই। তারা হয়তো সবাই নাস্তিক নয়—কিন্তু আকাশের ওপারের দেশটাকে স্বর্গের সীমানা ধরে নিয়ে মহাকাশ অভিযানে বিরত নয়। মানুষের অভিযান চলুক, কিন্তু সেই অভিযান যে সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্যে তার প্রমাণও থাকা চাই।

কিছুদিন আগে আমেরিকার ব্রুকলিন হাসপাতালে একটি শিশু পাকস্থলীতে একটি বুলেট নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়।

মাতৃগর্ভস্থ শিশুর পাকস্থলীতে বুলেট থাকা নিয়ে বেশ মজাদার সংবাদ সৃষ্টি করা যেতে পারতো, বিশেষত, সে ধরণের সংবাদ পরিবেশন করার জন্যে সংবাদ প্রতিষ্ঠান আছে এবং সে সংবাদ ক্রয় করার মতো সংবাদ পত্রও আছে।

আমেরিকার হাসপাতালের শল্যবিদদের বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে বলতে হবে। তা নইলে তারা বুলেট জাতীয় বস্তু কারখানায় তৈরী—এই ধারণা নিয়ে, কেন অনুসন্ধান করতে বসবে? কিভাবে শিশুর পাকস্থলীতে বুলেট প্রবেশ করলো, এটাই তাদের কাছে কৌতুককর ও জিজ্ঞাস্য। অনুসন্ধানের পর রহস্য ভেদ করতেও বিলম্ব হলো না। জানা গেল, শিশু যখন মাতৃগর্ভে ছিল—তখনই পূর্ণগর্ভা জননী তলপেটে গুলি খেয়েছিলেন। সেইগুলি শিশুর গণ্ডদেশ ভেদ করে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সেই গুলি আপনা থেকে বের হয়ে পড়ায় শিশুর জীবন রক্ষা পায়।

অথচ এ ধরণের সংবাদের উপর ভিত্তি করে এমন একটা সংবাদ তৈরী করা অসম্ভব ছিল না যে, একটা শিশু জন্মলাভ করেই বুলেট বমি করেছে আর তা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গাড়ি বোঝাই করে যুদ্ধক্ষেত্রে, অতএব যুদ্ধজয় অনিবার্য।

এখনো পর্যন্ত, অন্ধ-বিশ্বাসীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় এ ধরণের বিকৃত সংবাদ আমাদের দেশে প্রচার করা সম্ভব হয়।

আমাদের দেশের মানুষের অজ্ঞানতার কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে যায়—সেই এক দ্বীপের কথা, যেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন বহু কাল আগে এক পর্যটক দেশ খুঁজে বেড়ানোর নেশায়। সে দ্বীপের অধিবাসীরা সভ্যতার কিছুই খবর পায় নি। চারদিকে তাকালেই মনে হয়, এখানের আদম ও ইভ জ্ঞান-বৃক্ষের ফল বুঝি খায় নি!

বিপদে পড়লেন পর্যটক। তাঁর জীবন নিয়ে টানাটানি। কৌতূহলের বশে তাঁকে নিয়ে প্রথমে বেশ কৌতুক করলেও নর-খাদক মানুষগুলির জিভে জল আসতে লাগল। তারা ঠিক করলো তাঁকে তাদের দেবতার সামনে হত্যা করে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। পর্যটক সমস্ত অবস্থাই বুঝলেন এবং এও জানলেন, বাঁচা অসম্ভব।

কিন্তু মাথায় একটা বুদ্ধি এলো পর্যটকের। তিনি তাদের কোনো মতে বুঝিয়ে দিলেন যে, তারা তাঁকে হত্যা করবে ঠিক করেছে তাই অমঙ্গল ঘিরে আসছে। অচিরে পৃথিবী দিনমানেই অন্ধকারে ডুবে যাবে। তবে, হ্যাঁ, তারা যদি তাদের সে অভিসন্ধি ত্যাগ করে—তাহলে তিনি আবার সূর্যের আলো জ্বেলে দেবেন। যেমন দিন-রাত আসে ও যায়, তেমনি আসবে ও যাবে।

নর-খাদক সেই মানুষেরা যেমন অলৌকিকতায় বিশ্বাসী তেমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন—এটুকু বুঝতে

পেরেছিলেন বিজ্ঞান চেতন পর্যটক। সুতরাং বাঁচার তাগিদে বিজ্ঞানের কৌশলকে তাদের সংস্কারের ভীত্তিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করলেন।

অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলো সেই সব নর-খাদক মানুষ। হাতে তাদের ধারালো পাথর। এই হত্যা করে আর কি—এমন অবস্থা।

দেখতে দেখতে সূর্য ঢাকা পড়লো। দিনমানেই নেমে এলো অন্ধকার। নর-খাদক মানুষগুলি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাঁধন খুলে দিল পর্যটকের। আবার সূর্য উঠলো। পর্যটক সে যাত্রা বেঁচে গেলেন। তিনি কি ভাবে বাঁচলেন? নিশ্চয়ই তাঁর কথায় সূর্য উদিত হয় না বা অস্ত যায় না। আসলে তাঁর জানা ছিল সূর্য-গ্রহণের তারিখ। নর-খাদক মানুষগুলি কালেভদ্রে সূর্য-গ্রহণ বা চন্দ্র-গ্রহণ দেখলেও তা ভয়ের সঙ্গেই গ্রহণ করেছে। কবে তা হয়, তা তাদের ধারনার বাইরে। সুতরাং হঠাৎ সূর্য ঢাকা পড়ে যাওযায় তারা পর্যটকের অলৌকিক শক্তিকে বিশ্বাস করলো এবং তাঁকে আর হত্যা করলো না।

আমরাও জানি, সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চন্দ্র প্রকৃতির নিয়মে এসে পড়লে সূর্য-গ্রহণ হয়। কিন্তু গ্রহণ সম্পর্কে আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত মানুষের ধারণা কী—তা আমরা যাচাই করে দেখি না। একবার দেখলেই বোঝা যাবে—আমরা কোথায় আছি! তারপর গ্রহণ হলে সৌরজগতের অবস্থার কি পরিবর্তন হয় বা না হয়—তা অন্য কথা।

সংবাদপত্রে কিছুদিন আগে একটা খবর বের হয়েছিল। মস্ত খবর না হলেও চমকপ্রদ খবর। একটা গাছ রাত হলেই হেলে পড়ে, দিনে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

বলা উচিত, এ ধরণের সংবাদ নোতুন নয়। অথচ এ নিয়ে হৈ-চৈ কম হয় না। বিদ্যানিধি যোগেশচন্দ্র রায় তখন বেঁচে ছিলেন। তাঁর কানে গেল ঐ ধরণের এক সংবাদ। সাহিত্যের দরবারে তাঁর অবাধ প্রবেশ থাকলেও মূলত, তিনি বিজ্ঞানী। তিনিই প্রমাণ করলেন যে, গাছের ঐ ভাবে শুয়ে পড়া বা পুনরায় খাঁড়া হবার কারণ হচ্ছে—গাছের তলাকার মাটি। রাত্রিকালে মাটি আর্দ্র থাকে বলেই গাছ হেলে পড়ে। দিনে সূর্যতাপে মাটি শক্ত হয়ে উঠলেই গাছ মাথা তুলে দাঁড়ায়। অবশ্য এর সঙ্গে শিকড়ের শক্তির উপর গাছ নির্ভরশীল।

আমাদের মনে হয়, সংবাদ প্রকাশের ভার যাঁদের উপর তাঁদেরও হতে হবে যতদূর সম্ভব দায়িত্বশীল ও বিজ্ঞানসচেতন। তা যদি তাঁরা না হন, তাহলে নিরক্ষর মানুষগুলিকে শিক্ষিত করে তোলা যাবে না। বরং তাদের মন আরো বেশি অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার ও অলৌকিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। আমরা কি সত্যি এই অবস্থা চাই? আমরাই ত· কখনো কখনো দেখেছি, নিরক্ষরের মধ্যেও জ্ঞানের দাপ্তি। বরং সেই দীপ্তিকে এ অবস্থায় আরো দীপ্ত করে তোলাই উচিত। হঠাৎ গুজব রটিয়ে তাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলার অধিকার কারো নেই।

অথচ এটাও সত্য যে, এগোতে গেলেই প্রতি পদে বাধা ও অলৌকিকতার হাতছানি। একথা

জেনেই প্রাচীন যুগে মানুষ বের হয়েছে, একালেও মানুষ এগিয়ে চলেছে। রহস্য ভেদ করাতেই বিজ্ঞানধর্মী মানুষের গভীর আনন্দ। সেখানেই তার জয়।

ভূপর্যটক মার্কোপোলো সেই কবে পার হচ্ছিলেন গোবি মরুভূমি। পার হতে হতে শুনতে পেলেন বালিময় শূন্য মরুভূমিতে কান্নার কলরব। তাঁর মনে হলো, মরুভূমি বুঝি কাঁদছে।

সে-কাহিনী তিনি অনেককেই বললেন। কেউ এই আজগুবি কথা বিশ্বাস করলো, কেউ বা দিল হেসে উড়িয়ে।

কারো কারো ধারণা হোল, সে দেশে যাতে আর কেউ না যায়, সে কারণে এমন অবিশ্বাস্য কাহিনীর সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর একজন ইংরেজ পর্যটক গোবি মরুভূমি পার হতে গিয়ে শুনলেন সেই কান্না। কান্না যেন বীণার ধ্বনির মতো! আরো অনেকেই শুনলেন। বহুদিন পর রহস্য ভেদ করাও সম্ভব হোল। দেখা গেল—মরুভূমির কান্না বলে যা মনে হয়, সেই কান্নার মূলে আছে বালির স্তূপ। উপরে হাল্কা বালুকারাশির স্তরের নিচের অংশে থাকে জমাট বালির স্তূপ। জমাট-বাঁধা বালির উপরের হাল্কা বালি খসে পড়লে, এই দুই বালির স্তরের মধ্য অংশে সৃষ্টি হয় এক ধরণের শূন্যতা। সেখানে বায়ু প্রবেশ করলেই করুণ সুরের সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো বালিতে বালিতে ধাক্কা লাগলেও শব্দ সৃষ্টি হতে পারে। প্রশস্ত শুকনো নদী পার হতে গিয়ে অন্ধকার রাতে গ্রীষ্মের সামান্য ঝড়েই সে রকম শব্দ আমরাও শুনেছি। বালিতে বালিতে ঠোকাঠুকি হলে শব্দ না ওঠার কারণ নেই, যেমন অবাক হবার কিছু নেই যদি মেঘে মেঘে ঠোকাঠুকি লাগলে বজ্রনাদের সৃষ্টি হয়।

মানুষ ভূপ্রকৃতির বহু অংশই জেনেছে, সে এখন মহাকাশচারী। অনেক অলৌকিকতার অসারতা প্রমাণ করে সে এগিয়ে চলেছে। তবু ক'জন লোক আজো বলতে পারে যে, তারা অন্ধ বিশ্বাসী বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়। বরং অশিক্ষা বা অজ্ঞানতার এমনই দোষ যে, সেই অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কিছু বললেই বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়। জানি না, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের কারণ কি থাকতে পারে। তবুও আমরা বড়াই করি, আমরা বিজ্ঞানের আশীর্বাদে সভ্যতার আলোকে স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন। সত্যি কি এখনো আমরা তা হতে পেরেছি?

বীরবলের গল্প

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

বীরবলের নাম তোমরা হয়ত জানো। তিনি ছিলেন সম্রাট আকবর বাদশাহের একজন সভাসদ। তাঁর সংগীত ও কবিতা রচনায় সম্রাট মুগ্ধ হয়ে তাঁকে রাজা উপাধিতে বিভূষিত করে জায়গীর দান করেছিলেন।

রাজা মহারাজাদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য এইসব সভাসদদের বিশেষ প্রয়োজন হত। অবসর সময়ে বসে গল্প, কবিতা ও সংগীত রচনা করে সম্রাটের মনোরঞ্জন করতেন বীরবল। হাস্যরসের একমাত্র ভাণ্ডারী বললেও অত্যুক্তি হয় না বীরবলকে।

একদিন সম্রাট দিল্লীর প্রাসাদে বসে বীরবলের সাথে খোসগল্প করছিলেন। কথায় কথায় সম্রাট আকবর প্রশ্ন করলেন বীরবলকে, আচ্ছা বীরবল, এই পৃথিবীতে সবচেয়ে অকৃতজ্ঞ কে এবং কৃতজ্ঞই বা কে, এই প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতে হবে।

বীরবল একটু ভেবে বললেন—বড় কঠিন প্রশ্ন সম্রাট! তবে, আমাকে দু'একদিন সময় দিতে হবে, ভেবে-চিন্তে আপনার এই প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য।

তথাস্তু, বলে সম্রাট আবার একটু গম্ভীর সুরে বললেন—যে অকৃতজ্ঞ বলে স্থির হবে, তাকে আমি কঠোর শাস্তি দেব! দয়া, ক্ষমা তার জন্য আমার কাছে কেউ আশা করতে পারবে না।

—কি শাস্তি সম্রাট?

—প্রাণদণ্ড!

—প্রাণদণ্ড! বীরবল চিন্তিত হলেন মনে মনে। কিন্তু সম্রাটের কাছে সে ভাব গোপন রেখে যথাসময়ে গৃহে ফিরে এলেন।

রাত্রিবেলা বীরবলকে একটু অন্যমনস্ক দেখে তাঁর কন্যা প্রশ্ন করলে—বাবা, আজ তোমাকে একটু আনমনা দেখছি কেন হঠাৎ?

বীরবল সবিস্তৃত সম্রাটের এক আজগুবী প্রশ্নের সমাধানের কথা স্বীয় কন্যার কাছে ব্যক্ত করে চুপ হয়ে বসে রইলেন।

কন্যা সাথে সাথেই জবাব দিলে—সেজন্য তুমি কোন চিন্তা-ভাবনা করো না। এর উত্তর আমি তোমায় কাল রাজসভায় যাবার সময় বলে দেব।

বীরবল মৃদু হেসে বললেন—তুমি কি করে পারবে? আমি যা' মনে মনে চিন্তা করে খুঁজে বের করতে পারছি নে, তুমি কি করে তা' বলতে পারবে, এও কখন হয়!

বীরবলের কন্যা জোর দিয়ে বললে—ঠিক দেখো তুমি, আগামী কাল রাজসভায় যাবার সময় আমি তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেব, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো!

বীরবল ফের প্রশ্ন করলেন—সত্যি ?

—সত্যি, সত্যি, সত্যি। নিশ্চয়ই দেব। তুমি কিচ্ছু ভেব না।

এমন সময় বীরবলের জামাতা এসে হাজির হলো। জামাতাকে দেখে বীরবল ভারি খুশী হয়ে বসলেন—অনেকদিন পর এসেছ, দিনকয়েক থেকে যাও এখানে এবার।

জামাতা বাবাজী মৃদু হেসে জবাব দিল—আমার কি থাকবার অবসর আছে। বিষয়-আশয় নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত থাকি আমি। সেদিন এসে গেছি, আবার দরকার হলে পরে দেখা যাবে।

—তবু দিন কয়েক থেকে যাও। একটু বিশ্রাম ··

বাধা দিয়ে বললে জামাতা—আর বিশ্রামের কথা বলেন কেন ? কাজের মানুষের আবার বিশ্রাম, সুখ আছে নাকি ?

বীরবল এইসব কথা শুনে আর বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। তার মেয়েই মুখের উপর বললে—কাজের আর অন্ত নেই যেন। কাজর মধ্যে দুই, খাই আর শুই। ভাগ্যিস রাজা-মহারাজার মেয়ে বিয়ে করেছিলে বলে রক্ষা।

জামাতা বাবাজী সহসা আর কোন কথা বলতে কিংবা প্রতিবাদ করতে সাহসী হলো না। মনে মনে শুধু বললেন—এই তো জামাই ষষ্ঠী এসে গেল, তখন তো কাউকে নিমন্ত্রণ করতে দেখলুম না আসার জন্য। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর শেষে নিজেই এসে হাজির হয়েছিলাম। তখন কত আদিখ্যেতা···

বলা বাহুল্য বীরবলের জামাই-দেবতাটি ঘর-জামাই ছিলেন। বিশেষ কোন কাজকর্মে তার মতিগতি ছিল না। সর্বদাই ছিল একটা অসন্তোষের ভাব তার মনের মধ্যে জেগে। কিছুতেই তার সন্তুষ্টি ছিল না। কতকগুলি লোক পৃথিবীতে আছে, যারা বড় দুরাকাঙ্ক্ষ, সহজে কোন বিষয়ে খুশী হতে চায় না।

বীরবলের এক শ্যালকের ছেলে এ বাড়িতে ছিল। নাম তার হারু। হারু সারাদিনই বাড়ির পোষা বাঘা কুকুরটাকে বিনা কারণে প্রহার করে বেশ আনন্দ অনুভব করত। সারাদিন তাকে নিয়ে খেলাধূলার ছলে বেদম লাঠি পেটা করে দিন কাটিয়ে দিত।

একদিন তার পিসিমা তাকে একটু শাসনের সুরে ধমক দিয়ে বললেন—হারু, মিছিমিছি বাঘা কুকুরটাকে বেধড়ক মারধোর কর কেন ? বাঘা আমাদের অনেকদিনের পোষা কুকুর। রাত্রিবেলা চোর-ডাকাত আসতে পারে ওর দাপটে এ বাড়িতে ? কি একটি তৃণ কেউ নিয়ে যেতে পারে দিনের বেলায় বাগ-বাগিচা থেকে !

হারু মুখ উলটে জবাব দিল, কুকুর আবার একটা জীব নাকি ? ও কি মানুষের মত ভদ্রলোক না আর কিছু ?

—মানুষ না হোক, একটা নিরীহ জন্তু তো বটে। তা বলে দিন-রাত তাকে চাবুক-পেটা করা তো ভালো নয়।

হারুর পিসেমশায়ও সায় দিয়ে বললেন—কুকুরকে মারধোর সবাই করে থাকে। আমরা ছোটবেলায় কম ঠেঙিয়েছি আমাদের বাড়ির পালোয়ান কুকুরকে। পালোয়ান কত লোককে কামড়ে দিয়েছিল বলে বাবা তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবু ব্যাটা এসে রোজ রাত্রিবেলা দেউড়িতে শুয়ে থাকত। আর একটু শব্দ হলেই ঘেউ ঘেউ করেই আমাদের বাড়ি মাথায় তুলে নিয়ে ছুটে বেড়াত।

পিসিমা চুপ করে গেলেন সত্য, এইসব অবান্তর কথায় কান দেওয়া পিসিমার অভ্যাস নয়।

আগের দিন দিবা-রাত্রি ঘরে চুপ করে বসে বীরবল অনেক সাধ্য-সাধনা করে দেখলেন, ঠিক মনের মত কোন জবাব তিনি বের করতে সক্ষম হলেন না। এদিকে বেলাও পড়ে এসেছে পরদিন, বীরবলের রাজসভায় যাবার সময় আগতপ্রায়। জামা-কাপড় পরিধান করতে করতে বীরবল তার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন—সেই প্রশ্নের উত্তর তো তুমি আমাকে বললে না। রাজসভায় যাবার সময় হয়ে গেছে আমার।

কন্যা তাড়াতাড়ি পাশের ঘর থেকে একখানি ছোট ভাঁজকরা কাগজের টুকরা বীরবলের হাতে দিয়ে বললে—এই নাও বাবা, এখানেই সেই কথার উত্তর আছে। রাজসভায় গিয়ে এই কাগজটি খুলে সম্রাটের কাছে সেই প্রশ্নের সমাধান করে দিয়ো।

বীরবল হৃষ্টচিত্তে রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত হতেই সম্রাট আকবর বাদশাহ তাকে সহাস্য বদনে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে আসন পরিগ্রহ করবার জন্য অনুরোধ করলেন। বীরবল উপবিষ্ট হয়ে সম্রাটের কুশল কামনা করে একটুখানি সময় নিঃশব্দে বসে রইলেন।

বীরবলের মুখে হাসি ফুটে উঠল। যখন সম্রাট প্রশ্ন করলেন, বীরবল, আমার প্রশ্নের সদুত্তর দাও।

বীরবল চিরকুটখানি খুলে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—সম্রাট, পৃথিবীতে সবচেয়ে অকৃতজ্ঞ হল জামাই, আর সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ হল গৃহস্থ বাড়ির কুকুর।

সম্রাট একটুখানি ভেবে বললেন—কুকুর সবচেয়ে কৃতজ্ঞ একথা স্বীকার করলুম। কিন্তু জামাই সবচেয়ে অকৃতজ্ঞ, একথা তো ঠিক বুঝতে পারলুম না।

বীরবল হাসিমুখে বললেন—জামাই-র জন্য আপনি যত কিছু করেন না কেন, সে কিছুতেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না। তার সর্বদাই এ কথাটি মনে হয়, ইহা তাহার ন্যায্য অধিকার। সুতরাং কৃতকজ্ঞতা প্রকাশ করা দূরে থাক, সে চিরদিনই অকৃতজ্ঞের মত বসবাস করবে।

সম্রাট তৎক্ষণাৎ বীরবলের যুক্তির কথা মেনে নিয়ে বলে উঠলেন—ঠিক বলেছ তুমি। তোমার অনুধাবন সত্য, বীরবল। তা' হলে সম্রাটের আদেশ কখনও বিফল হতে পারে না। জামাতার প্রাণদণ্ডের আদেশ আমি এইক্ষণেই দিলুম।

সম্রাটের কথা শুনে সভাসদগণ স্তম্ভিত এবং উপস্থিত সকলে হতবাক হয়ে পরস্পরের দিকে পরস্পর অপলক নেত্রে চেয়ে রইলেন। কারও মুখে টঁ-শব্দটি বেরুল না আর।

বীরবল একটুখানি থেমে সবিনয়ে নিবেদন করলে—সম্রাটের আজ্ঞা শিরোধার্য। কিন্তু আপনার জামাতার প্রাণদণ্ড দিলে তো চলবে না। এ পৃথিবীতে আমি, আপনি সকলেই কারও না কারুর জামাতা। তাহলে তো সবারই প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে হয়।

বীরবলের কথা শুনে সকলেই মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো। সম্রাটও এ হাসিতে যোগ না দিয়ে পারলেন না। তিনি বললেন—অদ্ভুত তোমার যুক্তিতর্ক। তোমাকে তর্কে পরাজিত করতে পারে, এমন লোক সংসারে বিরল! সম্রাট মনে মনে খুশী হয়ে বীরবলের উপস্থিত বুদ্ধির খুব তারিফ করতে লাগলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই বীরবল আফগানদের হাতে কাবুলের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতর্কিতে রাত্রিবেলা তাঁর শিবির আক্রমণ করেছিল আফগানরা এবং যুদ্ধ করবার সুযোগের প্রারম্ভেই তিনি হঠাৎ বন্দী হয়ে যান।

আকবরের নবরত্নের সভার একটি উজ্জ্বল রত্ন খসে পড়ল সহসা ভিনদেশে, লোকজনের চক্ষুর আড়ালে।

আগ্রার কাছে ফতেপুর-সিক্রিতে বেড়াতে গেলে তোমরা এসব নিজের চোখে দেখে আসতে পারবে।

শরীরচর্চা বিষয়ক আলোচনা

জাতির শক্তি—দেশের শিশু

মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকার

কেবল বই পাঠ করে শিক্ষা হয় না। শিক্ষা তখনই সার্থক হয়, যখন আমাদের শরীর ও মন দুই-ই উপযুক্ত হয়ে ওঠে। যখন আমরা আমাদের কাজ দেখাতে পারবো—তখনই আমাদের ব্যক্তিত্ব প্রদর্শন করা সম্ভব হবে। যারা ব্যক্তিত্ব প্রদর্শনে অক্ষম তখন বুঝে নিতে হবে যে, তাদের দেহ ও মন উপযুক্ত নয়। আবার যারা রোগ নিবারণের দিকে দৃষ্টি দেয় না, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব প্রদর্শন ক্ষমতা

নেই তা বলা যেতে পারে। তেমন যারা আরোগ্যকর ঔষধের কথা ভাবে না তারাও কোন ব্যক্তিত্ব প্রদর্শন করতে পারে না। এটা আমাদের জানতে হবে যে, জগৎ আজ অনেক বদলে যাচ্ছে। তার সঙ্গে বদল হচ্ছে মানুষের শক্তি—আর বদল হচ্ছে তাদের জীবনীশক্তি। এই যে একটা অভাব আজ আমাদের মধ্যে এসে পড়েছে, এর জন্য আমরাই কেবল একমাত্র দায়ী। কিন্তু সেদিন আর আমরা এদিকে অজ্ঞ থাকবো না—যেদিন আমরা শিক্ষা সহযোগে আমাদের দেহ ও মন সুস্থ করে তুলতে সচেষ্ট হব। এরজন্য আমাদের জাতীয় সরকার প্রতি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দেহ ও মন গড়ে তোলার দিকে অতি অবশ্যই মনযোগ দেবেন। দেশকে গড়ে তুলতে হলে জাতিকে সুস্থ করে তুলতে হবে। তার জন্য জাতির যে প্রথম শিক্ষা সোপান বিদ্যালয় আছে, সেখানে আমাদের প্রস্তুত হয়ে উঠতে হবে যাতে আমরা দেশের ও দশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারি।

আমাদের দেশের জাতীয় সরকার অতি অবশ্যই প্রত্যেক শিশুদের সুযোগ করে দেবেন যাতে তারা দেশের শিশুদের গড়ে তুলতে পারে। জাতি দুর্বল থাকলে বুঝতে হবে যে, জাতীয় সরকার সত্যিই দুর্বল। আমেরিকায় থাকাকালীন দেখেছি, জাতীয় সরকার শিশুদের উন্নতির জন্য বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে থাকে। তেমন বৃটেনেও দেখেছি, শিশুদের উন্নতির জন্য জাতীয় সরকার বিশেষ সজাগ। কেবল আমরা এদিকে অনেক পেছিয়ে। কেননা, এদিকে আমরা বিশেষ শিক্ষিত নই।

এখন সত্যিই যদি আমাদের জাতীয় সরকার তাদের মনের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চান, তবে আগে শিশুদের স্বাস্থ্য গঠনের দিকে মন দিতে হবে। লক্ষ্য করে দেখলেই দেখা যায় যে, আমাদের স্বার্থপর দৃষ্টি-ভঙ্গীর জন্য আমরা শিশুদের স্বাস্থ্য গঠনের দিকে বড়ই পেছিয়ে পড়েছি। এখন আমি কয়েকটা পথের সন্ধান দিতে পারি যা বিদেশে দেখে এসেছি। মনে হয়, তাতে দেশের শক্তি ও বল দুই-ই বেড়ে উঠবে। আমাদের জাতীয় সরকার এদিকে মন দেবেন কি?

প্রতি দু-এক বছর অন্তর শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বন্দোবস্ত করতে হবে। দেখতে হবে শিশুদের চোখ, দাঁত ও কান ঠিক আছে কিনা? দেখতে হবে তাদের বিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাল হয়ে আসছে কিনা? তাদের বাঁচাবার জন্য বা রক্ষা করার দিকে মন দেওয়া হয়েছে কিনা? শিশুদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য জ্ঞান দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে কিনা? প্রতিদিন একবেলা অন্ততঃ সুখাদ্য দেবার বন্দোবস্ত হয়েছে কিনা? রোজ খেলাধূলা ও ব্যায়াম দ্বারা ভাল পেশী গড়ে দেওয়ার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে কিনা? বিদ্যালয়ের পরে খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদের কোনও আয়োজন আছে কিনা?

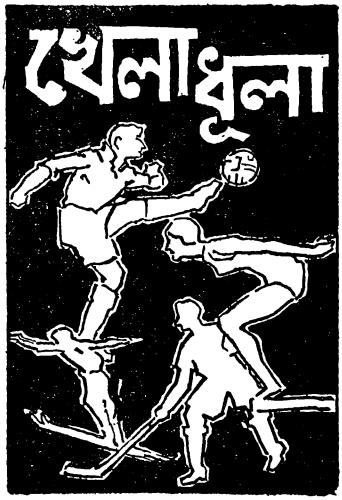

শ্রীঅমিতাভ

সবেধন নীলমণি একটা সোনার মেডেল তাও হাতছাড়া। তবুও ভাল ব্রোঞ্জটা কপালে জুটেছে। অবশ্য অলিম্পিক গেমসের সুরুতেই নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ডিগবাজী খাওয়া দেখে আমাদের বোঝা উচিত ছিল যে, ভারতীয় হকিদলের স্বর্ণস্বপ্ন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। ভারতীয় হকির কর্ম-কর্তারা এখন নানান অজুহাত খাড়া করার চেষ্টা করেছেন এবং করবেনও কিন্তু এই সব অজুহাত আমাদের হকির হৃত গৌরব উদ্ধারের খুব সহায়ক হবে কি? সময় থাকতে তাঁরা কিছু করেন নি ফলে আজ ভারতীয় হকিদলের এই দুর্দশা। অলিম্পিকে ভারতীয় হকিদলের এই হাল দেখে দেশের সব লোকই খাপ্পা, এমনকি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীও পর্যন্ত অসন্তুষ্ট।

বিপদ সঙ্কেত পেয়েও সময় থাকতে সাবধান হবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি ভারতীয় হকির কর্ম-কর্তারা। প্রবীণ খেলোয়াড়দের ওপরই বেশী ভরসা রাখা উচিত হয় নি, নবীন খেলোয়াড় নিয়ে দল গড়লে ভাল হত। অবশ্য একটু শিক্ষার খুবই প্রয়োজন ছিল। মিউনিকের আগামী অলিম্পিক লক্ষ্য করে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে, আর আগামী এশিয়ান গেমসের পাকিস্থানের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করে বুঝতে হবে প্রস্তুতির সফলতা।

ভারতীয় প্রতিনিধিদল অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করার জন্যে মেক্সিকো বেড়াতে গিয়েছিল। বেশ বোঝা যায় আমাদের এ্যাথলেটদের কেরামতি দেখে। অবশ্য কুস্তিগীররা তবু একটু লড়েছেন। সবচেয়ে লজ্জার কথা যে আমাদের এ্যাথলেটরা অলিম্পিকের প্রাথমিক যোগ্যতার মাপকাঠিই ডিঙোতে পারেন না।

মেক্সিকোর অলিম্পিক গেমসের বিস্ময় হল কেনিয়া। আফ্রিকার এই কেনিয়া স্বাধীনতা লাভ করেছে মাত্র কয়েক বছর আর এর মধ্যেই তারা খেলাধূলার যথেষ্ট তৈরী হয়েছে তার প্রমাণ পদক তালিকা। কেনিয়া পেয়েছে তিনটি স্বর্ণ-পদক, চারটি রৌপ্য-পদক এবং দুইটি ব্রোঞ্জ-পদক।

প্রথম তিনটি স্থান পদক তালিকায় পেয়েছেন যথাক্রমে আমেরিকা, রাশিয়া এবং জাপান। আমেরিকা মোট পদক লাভ করেছে ১০৬টি এরমধ্যে ৪৫টি স্বর্ণ-পদক। ইতিপূর্বে ১৯৬০ সালে রোমে

রাশিয়া সংগ্রহ করেছিল ১০৩টি পদক। কিন্তু এবার রাশিয়া ঠিক সুবিধে করে উঠতে পারে নি। তারা আমেরিকার অনেক পেছনে থেকে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে, মাত্র ২৯টি স্বর্ণ-পদক।

মেক্সিকোর অলিম্পিক গেমস যে ভালভাবে সম্পন্ন হয়েছে এটা খুবই ভাগ্যের কথা। কারণ যেভাবে ছাত্র হাঙ্গামা সেখানে শুরু হয়েছিল, তাতে গেমস প্রায় বানচাল হতে বসেছিল। মেক্সিকোর ওপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা সাফল্যের সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়েছে। একমাত্র অসুবিধে সেখানে ছিল মেক্সিকো শহরের ৭৩৫০ ফুট উচ্চতা সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে। কিছু এ্যাথলেটদের এই উচ্চতা একটু বেগ দিয়েছে। যাই হোক ১৯৬৮-র মেক্সিকো অলিম্পিক এখন খেলার ইতিহাসের পাতায় স্থান পেল। এরপর লক্ষ্য ১৯৭২ সালের অলিম্পিক স্থান মিউনিক।

পার্থসারথি স্মৃতি পুরস্কার

রচনা প্রতিযোগিতা

১৯৬৬ সালের ৭ই মে আমাদের প্রিয় গ্রাহক পার্থসারথি সেনগুপ্ত অকালে দেহত্যাগ করে। পার্থসারথির জন্মদিন ছিল ২০শে অগ্রহায়ণ (৬ই ডিসেম্বর) তার শোক-সন্তপ্ত পিতা-মাতা প্রতি-বছরের মতো এবারও একটি স্মৃতি-পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। এজন্য একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হল। এই প্রতিযোগিতা শিশুসাথীর গ্রাহক-গ্রাহিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রতিযোগিতার বিষয় হল—যে কোনও একটি ভ্রমণ-কাহিনী। ফুলস্ক্যাপ কাগজের ৭ (সাত) পৃষ্ঠার মধ্যে পরিস্কার করে লিখবে। কাগজের দুই পাতায় লেখা গ্রাহ্য হবে না। ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করা চলবে। ভ্রমণ-কাহিনীটি ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে শিশুসাথী অফিসে পৌঁছান দরকার। নাম, গ্রাহক-সংখ্যা এবং বয়স অবশ্যই উল্লেখ করবে। খামের উপর 'পার্থসারথি-স্মৃতি-পুরস্কার প্রতিযোগিতা' এই কথাগুলি লিখে দেবে।

প্রথম পুরস্কার— ১৩৲ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার— ৭৲ টাকা

নতুন ধাঁধা

শ্রীফাগুরাম সোরেন

১। হাতে হয় যা
পা তলাতেও তা।

২। ৩০০এর ২০০ বাদে ১৩ যুক্ত হৈল, সওয়া চার গণ্ডা উত্তর কেমনে তা বল।

৩। লাইন ধরে বসে আছে মাত্র ছয় জন, গণনায় **বার** পাই সে আবার কেমন।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। দুই বিঘা জমি ২। দীনদান ৩। ছাত্রধারা ৪। সর্বহারা
৫। ব্রাহ্মণ ৬। সাধনা ৭। নিষ্ফল কামনা ৮। সুখ
৯। মানসলোক ১০। আবেদন ১১। আগমন

৩নং শ্রীকালিদাস রায়, ৪নং কাজী নজরুল ইসলাম, ৮নং কামিনী রায়
এবং বাকী আটটি রবীন্দ্রনাথের লেখা।

কোন গ্রাহক-গ্রাহিকাদের নিকট হইতে গতমাসের ধাঁধার উত্তর না পাওয়ায় কাহারও নাম প্রকাশ করা হইল না।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করছি, সম্প্রতি শিশুসাথীতে শ্রীযুক্ত রথীন সরকার 'জাপানের দীর্ঘপুচ্ছ মোরগ' 'গন্ধবহ চলচ্চিত্র' 'তোমরা কি সশব্দে চিন্তা কর' 'টেলিভিসন' ইত্যাদি বিজ্ঞান বিষয়ক যেসব আলোচনা করেছেন, তার কোনটাই তাঁর নিজের লেখা নয়। সব লেখাই শিশুসাথীর পুরোনো লেখক শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামীর 'বিজ্ঞানের যুগান্তর' নামক বই থেকে হুবহু নকল করা। এই জাতীয় মনোবৃত্তি অত্যন্ত লজ্জাজনক ও গর্হিত অপরাধ। লেখকের দায়িত্ব এবং সততার উপরেই আমরা নির্ভর করে থাকি। ভবিষ্যতে শ্রীরথীন সরকারের কোন লেখা শিশুসাথীতে আর প্রকাশিত হবে না এবং তাঁর সঙ্গে শিশুসাথীর কোন সম্পর্কও থাকবে না।

—সম্পাদিকা

সম্পাদিকার চিঠি

ছোট বন্ধুরা,

অঘ্রাণের এই চিঠি লেখার সময় দেখছি, এখনও এশহরে তেমন শীত পড়ে নি। ভোরবেলাকার বাতাস অবশ্য অল্প-সল্প ঠাণ্ডার আমেজ বয়ে নিয়ে আসছে। বাংলাদেশে শীত এবার কোন নূতনত্বের আস্বাদ নিয়ে আসছে না! যদিও উত্তরবঙ্গে দ্রুতগতিতে শীত চলে আসছে।

৺বিজয়ার পর ছত্রভঙ্গ হয়েছে সারা বাংলাদেশ! বিধাতার ক্রোধ অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে বন্যা-বিধ্বস্ত বাংলাদেশে। মেদিনীপুরের বন্যার প্রকোপ শেষ হতে না হতেই পাহাড়ি ধ্বস আর বন্যায় উত্তরবঙ্গের জনকোলাহলপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে নেমে এসেছে শ্মশানের স্তব্ধতা আর বীভৎসতা। আবার কবে যে সে সব অঞ্চলে আগের মত স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চলতে পারবে, তা যেন অবিশ্বাস্য দুরাশা বলেই মনে হচ্ছে।

আমাদের বহু গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং লেখকের নিবাস উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে। এঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই কোন খবর আমরা এখনো পাই নি। এঁদের কুশল-সংবাদ পেলে আমরা সুখী হবো।

বন্যাক্লিষ্ট, অসহায়, নিঃস্ব, আতুর মানুষগুলির কথাই আজ সবচেয়ে বড় চিন্তার কথা। সাহায্যের প্রয়োজন এখনো শেষ হয় নি। কাপড়-জামা, খাদ্য, ঔষধ এসবের খুবই প্রয়োজন এখন। গৃহহারাদের পুনর্বাসনের জন্য টাকা-কড়িরও দরকার। তোমরা যে যেমন পারো, যার যেমন ক্ষমতা, সেইভাবেই সাহায্য করো। তোমাদের সংগৃহীত জিনিষগুলি এবং টাকা-কড়ি যথাশীঘ্র সম্ভব কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দাও। মনে রেখো, তোমাদের কাছ থেকে পাওয়া সামান্য দু'চার পয়সাও আজ অসামান্য। 'ক্ষুধিতেরে অন্নদান সেবা' কার্যে তোমাদেরও একটা সক্রিয় অংশ আছে। গত মাসের শিশুসাথীতে শরীরচর্চার বৈঠকে এসম্বন্ধে তোমাদের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের আশা, এই আবেদন নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে না।

গত ১৪ই নভেম্বর ছিল স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর পবিত্র জন্মদিন। তিনি ভালবাসতেন শিশুদের। তাদের সঙ্গে তিনি শিশুর মতই অসঙ্কোচ সরলতায় এক হয়ে যেতে পারতেন। তাঁর জন্মদিন স্মরণ করে ভারতের নানা জায়গায় শিশু-দিবসের উৎসব হয়।

আজকের চিঠি এখানেই শেষ করি। আমার প্রীতি ও শুভকামনা নিও।

১লা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৫

শুভার্থিনী
তোমাদের সম্পাদিকা

সম্পাদিকা—শ্রীমতী দাশগুপ্ত
৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীনারসিংহ প্রেস হইতে
শ্রীরামকৃষ্ণ পাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Phone : 67-3329

Good Dog-Chuck means that of

NATIONAL

MACHINE TOOLS CO.

(N. M. T. Co.)

Manufacturers, Repairers and Dealers :—

Head Office & Factory :—

10/10, Brindaban Mullick Lane, Kadamtala, Howrah.

(W. B.)

বেবী তলমিশ্রি

পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক
সর্বত্র প্রদর্শিত ও বিক্রীত

পাম রিসার্চ এণ্ড কেমিক্যালস
কলিকাতা-৪৭

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - বরুন রেজ
স্ক্যান করেছেন - বরুন রেজ
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

dhulokhela@gmail.com